ত্রিপদী

বিমল কর

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম
সংস্করণ ঃ
৭ই আষাঢ়, ১৩৬১

দুটাকা
চার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীতমসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

"ত্রিপদী" ১৩৫৯ শারদীয় 'জনসেবকে' প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশের সময় সামান্য কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। এই সুযোগে শ্রীশান্তিকুমার মিত্র ও শ্রীসাগরময় ঘোষকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিমল কর

ওরা ছিল তিনজন, তিনবন্ধু ; মন্মথ, চারু আর দেবল। অমন মিল সচরাচর চোখে পড়ে না। আবার অমিলও। অনেকটা জীবতত্ত্বের জাতি-প্রজাতির মিল-অমিলের মতনই। প্রথম দর্শনে, প্রাথমিক গুণাগুণ বিচার ক'রলে সহজেই মনে হবে ওরা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র, একের সঙ্গে অন্য কারো সাদৃশ্য নেই, সামঞ্জস্য নেই। কি চেহারায়, কি বেশভূষায়, চলনে-বলনে তিনটি মানুষ তিন রকমের। বিদ্যে-বুদ্ধিতে আকৃতি-প্রকৃতিতে কোথাও ওরা এক নয়—তবু তারা কেমন করে না জানি তিনে এক হয়ে গিয়েছিল। কোথাও একটা ঐক্য খুঁজে পেয়েছিল নিশ্চয় তিনজনেই—তিনজনের মধ্যেই, মনের গভীরে, অন্তরে, স্বভাবে। কি যে এক নিগূঢ় বন্ধন দিয়ে বাঁধা ছিল ওদের তিনটি প্রাণ, তিনটি জীবন, কে জানে! সে এক পরম রহস্য ; যে রহস্য একই আকাশের তিনটি জ্যোতিষ্কে, একই মাটির তিনটি গাছে।

থাকত তারা একই জায়গায় ; পাথরচটিতে ; ভিন্ন তিন অঞ্চলে। দু-নম্বর খাদ যেখানে, যেখানে পাওয়ার-হাউস, কামারশালা, রিজারভারি, সেন সাহেবের বাঙলো, কোম্পানীর বাজার আর ভাটিখানা—সেই পাথরচটিতে

থাকত মন্মথ। অ্যাশলে কিংহাম কোম্পানীর সবচেয়ে পুরনো খাদ এই দু-নম্বর।

দু-নম্বর খাদের সোজাসুজি, পুব-দক্ষিণ কোণে প্রায় মাইলটাক তফাতে পাঁচ-নম্বর খাদ। এ অঞ্চলটার নাম মধুবন। অপেক্ষাকৃত নিরাভরণ, নিরালা, শান্ত। ছোট্ট একটা মেশিন-ঘর আর খাদ ; কয়লা বোঝাই করা ট্রলি, সাইডিং। কাছেই খড়-ছাওয়া খান কয়েক ঘর। বাবু-কোয়ার্টারস। সমস্ত জায়গাটার আশে পাশে কয়লার চাঁই, মরচে ধরা ভাঙ্গা লোহার পাত, বেঁকানো শিক আর তার সাথে আকন্দ, বুনো-তুলসী আর ফণিমনসার ঝোপ! এখানে থাকে চারু। ওই খড়-ছাওয়া ঘরের একটাতে। বকুলকে নিয়ে।

মধুবনের গা বয়ে কয়লার গুঁড়ো ছড়ান যে পথটা এঁকে বেঁকে—ধান ক্ষেত, মাঠ আর পলাশ বন পিছু ফেলে সোজা দেড় মাইলটাক পথ এগিয়ে গিয়ে থেমে গেছে কাঁঠাল, শিশু, অশ্বত্থগাছের ছায়ার তলায়—যেখানে টালির শেড ঢাকা সারবন্দী কতকগুলো ঘর এদিক ওদিক ছড়ান সেখানেই কোলিয়ারীর অফিস, হাসপাতাল আর সাত-নম্বর খাদ। কাছাকাছি দুটো পিট। এখানে সবাই ব্যস্ত—সবাই কাজের। সমস্ত জায়গাটাই যান্ত্রিক শব্দে, মানবিক মুখরতায় চঞ্চল, উচ্ছল। ঘড় ঘড় করে নামছে কেজ্, চাণকের মুখের ঘণ্টা বাজছে ঢঙ, ঢঙ—সাইডিং-এর ইঞ্জিন বাঁশির তীক্ষ্ণতায় বাতাস চিরে ফুঁসছে। কয়লা বোঝাই ট্রলিগুলো ঢালু পথে মেঘ ডাকার মত শব্দ করে নেমে আসে। লাইনে মালগাড়ি দাঁড় করান। কয়লা বোঝাই চলে। লোডিংবাবু হাঁক পাড়ে—'ওরে হুই ফুলমনি, বিটিরে তুর আসতে

মানা করিস কাল থেকে।…শালি, ঝুড়ি নামায়ে নাঙ্ পানে চায়। বলি; পিরীত করবি তো গাড়ি বোঝাই ক'রবে কোন্ বাপে তোর? হাজরি কাটা যাবে আজ।'

এই জায়গাটার নাম রাধানাথপুর। পাথরচটি কোলিয়ারীজ লিমিটেডের কনিষ্ঠতম কৃতী সন্তান। খাদ আর অফিসের একটু দূরে কাঁঠাল, শিশু আর অশ্বত্থগাছের ছায়ার তলায় খোদ অ্যাশলে সাহেবের খাস অফিস। ছোট দুখানি ঘর। দরজায় গভীর-নীল পর্দা। সামনে কাঁটাতার দিয়ে বেড়া-বাঁধা ফুলবাগান। পাতাবাহার আর মৌসুমী ফুল কিছু চোখে পড়ে। কাঁঠাল গাছের ছায়ার তলায় টিনের শেডের নীচে দাঁড় করান থাকে নতুন মডেলের ফোর্ডগাড়ি। আর সেই গাড়ির মধ্যে—বকের পালকের মত সাদা উর্দি গায়ে কী বাইরে গাড়ির পা-দানিতে বসে থাকে দেবল। হাতে কিংবা কাঁধে তার টেনিস বলের মতন ছোট্ট, সাদা নরম লোমে ঢাকা তুলোর পুঁটলির মত ক্ষুদ্র একটি জীব। অ্যাশলে সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া পিকিনিজ ডগ্। নাম যার 'জলি'। ক্ষুদে ওই কুকুরটার নাম দেওয়া নিয়ে দেবলের সঙ্গে চারুর ঘোরতর মতভেদ দূর করে চারুর বউ বকুলই তার নাম দিয়েছিল 'জলি'। সেই থেকে ও জলি-ই। দেবলের গভীরতম সুখ আর খুশী—আনন্দ আর আবেগের একমাত্র অংশীদার। তার নিত্যসাথী।

পাথরচটির তিন কোণে তিনবন্ধু ছড়িয়ে থাকলেও ওরা রোজ এসে মিলত একই জায়গায়। বিকেলের শেষে, সন্ধ্যে যখন হব হব—তখন। সন্ধ্যের অন্ধকারে মাঠে বসে, পথ চলতে চলতে ওদের যত রাজ্যের প্রাণের

কথা হ'ত; কোনো দিন বা যখন সাইকেলে চেপে তিনবন্ধু রওনা দিত শহরের দিকে সিনেমা দেখতে—তখন, তিনজনের সাইকেল পাশাপাশি এনে সমান গতিতে চালাতে চালাতে ওরা গলা ছেড়ে মনের কথা ব'লত। শুধু এই মাঠ আর সাইকেলে ওরা ওদের আড্ডাকে নিঃশেষ করতে পারে নি। প্রাণের কথা উজাড় করে ঢেলে দিতে, নিজেদের দৈনন্দিনকে পরস্পরের কাছে নিঃস্ব করে প্রকাশ করতে আরও কিছুর দরকার হ'ত, আর তাই ভাটিখানার প্রান্তসীমায় ছোট একটি ঘর ছিল ওদের—একান্তভাবেই ওদের তিনজনের। সেই ঘরে বসে ওরা তিনজনে নেশা করত, কথার আর মনের; আকণ্ঠ পূর্ণ হ'ত। অনেক রাত পর্যন্ত গলা জড়াজড়ি করে ওদের তখন নানা কথা; ভাল মন্দ, শ্লীল অশ্লীল—যার প্রাণে যা আসত তাই, তারই গল্প। কখনো হাসি, কখনো চীৎকার, কখনো কান্না—মাতলামির হরেকরকম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনবন্ধু আসর জমিয়ে রাখত। রাত যখন গভীর হ'ত—কিংবা কর্তব্যবুদ্ধি জেগে উঠত কারুর—এ ওকে ঠেলা দিত বাড়ি ফেরার জন্যে। নেহাত কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে সাইকেলে চেপেই ফিরত ওরা দুজন—চারু আর দেবল; ফিরতে হ'ত না মন্মথকে।

চারুর বাড়ির কাছে এসে সাইকেল থামত আর একবার। সিটে বসেই মাটিতে পা ছুঁইয়ে ভর রাখত দেবল; চারু নেমে পড়ত। বিদায় নিত চারু; বলত, 'যাই রে—'। কিন্তু সহজে যাওয়া হ'ত না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে আরও একটা দুটো বিড়ি ফুঁকত, দু-দশটা কথা কইত। খানিক পরে চারু আবার বিদায় চাইত, 'যাই রে, দেবলা!'

'কি যাই-যাই করছিস ? যাবি ত' যা না !'

দেবলের উষ্মায় চারু হঠাৎ ম্লান মুখে হেসে উঠত। কি ভেবে বলত, 'একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি কেটে পড়ব, দেবলা। মাইরি বলছি।'

'কাহে ?' কৈফিয়ত তলব করত দেবল।

'এখানে আর ভাল লাগে না !' চারু মনের অব্যক্ত একটা শূন্যতাকে বোঝাতে চাইত না, শুধু বলত, 'এ শালা কয়লার দেশ আর ভাল লাগে না, মাইরি। তোদের জন্যেই পারি না—, তোরা না থাকলে কবেই কেটে পড়তাম।'

দেবল অতশত বোঝে না। বলে, 'কি রাজা বাদশার মন রে—কয়লার দেশে দিল উঠছে না। যা না শালা, গিয়েই দেখ্। টেঙরি নিয়ে নেব।' কথা শেষ করেই প্যাড্‌লে পায়ের চাপ দেয় দেবল। সাইকেলটা এগিয়ে যায়। তারপর চোখের নিমেষে দেবলের চেহারাটা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারু।

সে সব কথা ভাবতে সকলেই মজা পায় আজও। বার দুয়েক ম্যাট্রিক ফেল করায় বাপের কাছে খুব বকুনি খায় চারু, লজ্জায় মরমে মরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে এখানে—এই পাথরচটিতে। চারুর দূর সম্পর্কের এক দাদা তখন পাথরচটি কোলিয়ারীতে সারভেয়ারী ক'রত। দাদার কথামত চারু হাতুড়ি পিটতে শুরু ক'রল। যামিনী কর্মকারের রেঞ্চ, প্লাস, হাতুড়ির বাক্স বয়ে বয়ে বছর খানেকের মধ্যেই চারু হয়ে উঠল ইলেকট্রিসিয়ান।

যে বছরে কোম্পানীর খাতায় চারুর চাকরি পাকা হ'ল, মাইনে হ'ল পঞ্চাশ—সেই বছরেই ওর দাদা চলে গেলেন ঝরিয়া—নতুন চাকরি নিয়ে, আর যামিনী কর্মকার পাম্প্-হাউসের পোস্টে উঠে বাতি লাগাতে গিয়ে কিভাবে যেন শক্ খেয়ে ছিট্‌কে পড়ল অমন তিনতলা উঁচু থেকে ঢালুর নীচে; পাথর, বালি আর ঝোপের মধ্যে। যামিনী মারা গেলে চারু হ'ল হেড্ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান। অন্য যারা ছিল তারা চারুর চেয়ে পুরনো হয়েও পাত্তা পেল না। তার প্রথম কারণ, চারুর বুদ্ধি ও চারুর বিদ্যে আর সবায়ের চেয়ে যে বেশি, সে কথা সেন সাহেব জেনে নিয়েছিলেন। এক সময় এই সেন সাহেবের বাচ্চা ছেলেকে পড়িয়েছিল চারু। মন জয় করে নিয়েছিল সেন সাহেবের মা—সারদা দেবীর। অন্য কিছু করে নয়। শহর থেকে বাজার হাট এনে দিয়ে আর কলকাতা থেকে গঙ্গাজলের ঘড়া বয়ে নিয়ে গিয়ে। সেন সাহেব এখনও আছেন, বেঁচে আছেন সেন সাহেবের মা-ও। সেন সাহেবের সেই ছেলে শহরের স্কুলে বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে। বেশ বড় হয়েছে জয়ন্ত। দেখা হ'লে আজও ডাকে—'চারুদা, ও চারুদা—চলুন না আমাদের বাড়ি।'

জয়ন্ত ছেলেমানুষ। জানে না, সেন সাহেবের বাড়িতে ঢোকার মত আভিজাত্য আর তার নেই। অত্যন্ত জরুরী কোনো কাজ যা চারু ছাড়া হবে না, শুধু তেমন কাজের ডাক পড়লেই কদাচিৎ তাকে যেতে হয়। না হ'লে পারতপক্ষে চারু ও-দিকের ছায়া মাড়ায় না। কোলিয়ারীতে সেন সাহেবকে দেখলে ও সরে যায়, পাশ কাটায়। সেন সাহেবের মা এবং স্ত্রী প্রতিমা বৌদি সত্যি সত্যি চারুকে স্নেহ করতেন। স্নেহ করতেন তার

অকপট সরলতার জন্যে। ভালবাসতেন, কারণ চারুর এমন একটা মন ছিল, যে মনকে ভাল না-বেসে পারা যায় না। আর চারুর এই মনই তার কাল হ'ল। হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিংরুম থেকে বকুলকে যে দিন চারু সটান এনে তুললে তার নিজের ঘরে, মধুবনে, সেই দিন থেকে। চারু অবশ্য বলেছিল বকুল তার বউ। কথাটা কিন্তু চাপা থাকে নি। লোকমুখে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন শশাঙ্কবাবু। ছেলেকে কত অনুনয়-বিনয়—'ছি, ছি, এমন করে তুই আমাদের বংশের মুখে চুনকালি মাখাবি, চারু? কোথাকার কোন্ বেজাত-কুজাতের ভ্রষ্টা মেয়ে—তাকে তুই ঘরে এনে তুল্‌লি!...'

বাপের কথায় চারুর মন টলেনি। শশাঙ্কবাবু গিয়ে ধরলেন সেন সাহেবকে। সেন সাহেব চারুকে ডেকে বললেন, 'এ যা শুনছি—সব সত্যি? তুমি নাকি মেয়েটিকে হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিংরুম থেকে নিয়ে এসেছ?' সেন সাহেবের চোখে চোখ রেখে যে চারু কখনো কথাই বলে নি—সেই চারু সেদিন সোজাসুজি সেন সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছে স্পষ্ট গলায়—'ভুলিয়ে আনি নি। কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে এনেছি।' 'বাড়ি থাকতে কালীঘাটে কেন?', জানতে চেয়েছেন সেন সাহেব। চারু বলেছে, 'আমার এক বন্ধু ওকে বিয়ে করবে বলে মামার বাড়ি থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। তারপর হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসিয়ে রেখে ওর গলার হার আর হাতের চুড়ি নিয়ে টিকিট কাটতে যাচ্ছি বলে পালিয়ে যায়। সেদিন আমিও ছুটি থেকে ফিরছিলাম এখানে। বকুল আমায় চিনত। আমিও চিনতুম তাকে। ডাক শুনে ওর

কাছে যাই। সব শুনে আমি ওকে বাড়ি ফিরে যেতেই বলি। ওর মামা, মামী কেউই লোক ভাল নয়। বকুল বাড়ি ফিরে যেতে চায় না। অগত্যা পরের দিন সকালে কালীঘাটে গিয়ে আমরা বিয়ে করি। আমি ওকে ঠাকুরের সামনে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করেছি, স্যার।' …গড় গড় করে চারু সব বলে গেল। কোনো লুকোচুরি নেই— ; কোনো সঙ্কোচ বা দ্বিধা।

সেন সাহেব কী পরিমাণ আশ্চর্য হয়েছিলেন সেদিন কে জানে। তবে চারুর চাকরি যথারীতি বজায় ছিল। এই নিয়ে কানা-ঘুষা চলতে লাগল। সেন সাহেবের মা অথবা স্ত্রী চারুকে মুখে কেউ কিছু বলেন নি। তবু চারুর মনে হ'ল, ওঁদের দৃষ্টিপাতে আর সেই আগের মত বিশ্বাস বর্ষিত হয় না, মুখের হাসিতে স্নেহের আলো জ্বলে না, কথায় বাজে না ভাল লাগার আবেগ। চারু সব বুঝল এবং নিজেকে আড়াল করে নিল ওঁদের আভিজাত্য-বোধের গণ্ডী থেকে।

বকুলের আসল পরিচয় জানার পর অমন যে কোলিয়ারীর বারোয়ারী সমাজ সেখানেও আঁকাবাঁকা কথা উঠেছে; চোখ টিপে কেউ হেসেছে, টিপ্পনী কেটেছে কেউ বা। সেই তখনই—চারু, মন্মথ আর দেবল তিন মূর্তি —ক্রমশই এক হয়ে আসছে। নদীর চক্রবৃত্ত-পাকে পড়লে ভেসে আসা খড়, কুটো, গরু, মানুষ, নৌকো সব যেমন এক দুরন্ত আকর্ষণের টানে কাছে এসে পড়ে—তেমনি ওরা তিনজনে ক্রমশই এক দুর্জ্ঞেয় আবর্তের কেন্দ্রে এসে পড়ছিল।

মন্মথ সব শুনে বলেছে, 'মরদের পারা কাজ করেছিস, চেরো। আলবৎ

শালা, কালীঘাটের বিয়ে—বিয়ে। যত সব বুজরুকি তোর বাপের। তোর বাপ কেনে—উ শালা বামুন কায়েতদের দস্তুরই উই। জাত লিয়ে ব্যাটারা ধুয়ে খাবে!'

মন্মথ নিজে শুঁড়ি। বামুন কায়েতদের ওপর তার তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই। বরং ও যেন একটু বিরূপই ওদের প্রতি।

চারুকে 'মরদ' বলা দেবলের তেমন মনঃপূত না হলেও, দেবল চারুর বিয়ে করার সৎসাহসকে মনে মনে প্রশংসা করেছে। কথা কোনকালেই দেবল বেশি বলতে পারে না; বলেও না। মাঝে মাঝে কখনো মদের ঘোরে মুখর হয় এই যা—নচেৎ দেবল স্বল্পভাষী; মিতবাক্। দেবল খালি বলেছে, 'সরম কিসের রে, চারু। আমার বাবুজী ছিল পাঞ্জাবী। মা বাঙ্গালী। কোন্ শালা তোকে ঠাট্টা করেছে—বল্। ও হারামিকে দিয়ে তোর পায়ে পড়ে আমি মাফি মাঙাবো।'

'ছেড়ে দে। আমি থোড়াই কেয়ার করি কিনা ওদের কথা!' উত্তর দিয়েছে চারু, 'দরকার পড়ুক। দেখিস না, কত ব্যাটা এসে সাধবে।'

চারু কিছু মিথ্যে বলে নি। এ তল্লাটে সকলেরই সব চেয়ে বড় সহায় চারু। মেয়ের বিয়েতে লুচি ভাজতে, ছেলের অসুখে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে সাইকেল ঠেলে ডাক্তার ডাকতে, শহর থেকে ওষুধ আনতে, বসন্ত রুগীর শিয়রে বসে সেবা করতে, মড়া পোড়াতে কে আছে চারু ছাড়া।

মন্মথ তাই ভাবে। বহুদিনের কথা—সেই তখন, যখন মন্মথর বাবা বেঁচেছিলেন। ভাটিখানার গদীতে বসতেন নিজে—সেই তখন। ভাটি-

ধানার দক্ষিণের মাঠটায় তখন বর্ষাকালে কোলিয়ারীর ছেলে ছোকরার মিলে পুরোদমে ফুটবল খেলত। সেবার ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারীর সঙ্গে পাথরচটি কোলিয়ারীর ম্যাচ খেলা হচ্ছে। বৃষ্টি হয়েছে সারাদিন—পিছল মাঠ। তবু সেদিন মাঠে কী ভিড়! দু-পাশে পাথরচটির ছেলে-ছোকরারা ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে সমানে চীৎকার করছে নিজেদের দলকে জেতাবার জন্যে। তবু পাথরচটির দল কিছুতেই অপর পক্ষের একটা গোল উশুল করতে পারছে না। খেলা শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই—বয়লার খালাসি হোসেন মিয়া ব্যাকে খেলছে। রেগে গেছে চাটগেঁয়ে ভূতটা। ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারীর সুন্দর মতন লিকপিকে ছেলেটা বল নিয়ে যেই না এগিয়ে এসেছে—হোসেন মিয়া তাকে মারল। কি মারল, লাথি না ঘুষি, পেটে না বুকে, কে জানে—ছেলেটা নেতিয়ে পড়ল। তারপর রক্ত-বমি। ভাটিখানারই একটা ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হ'ল ছেলেটাকে। এল কোলিয়ারীর ডাক্তার যতীনবাবু। কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। মন্মথর বাবা ভূষণ সাহা শহর থেকে ডাক্তার আনতে বললেন চারুকে। চারু আনল ডাক্তার। তারপর একরাত বা একবেলা নয়, ভাটিখানার সেই ঘরে বসে পুরো আটটা দিন চারু একা রক্ত ঘেঁটেছে অপরিচিত সেই ছেলেটির। শিয়র ছেড়ে ওঠে নি একমুহূর্ত; ঘৃণা করেনি তার মলমূত্র পরিষ্কার করতে। সেই জাতে চামার ছেলেটার মৃতদেহও ও বৃষ্টি-বাদলা মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে শ্মশানে। সাথী হয়েছিলেন ভূষণবাবু নিজে।' মন্মথ তখন সর্দিজ্বরে ভুগছে। নয়তো সেই যেত। মন্মথ জানে, বাবা তার বলতেন, 'জানিস মন্মথা, ওই ফিঙ্গে ছেলেটা জাতদেবতা।

উকে তুই কোনদিন ছাড়িস নে, বাপ! অমন স্যাঙ্গাত আর মিলবে না তুর। দেখ মন্মথা, তুর তরে আমি কিছু কমটা রাখি নাই। সম্পত্তি বাপ্ ফুড়ুকে উড়াই দেওয়া যায়। তাই যদি দিস, আমি তার খোঁজ লিতে তো আসব নাই। তবে কিনা যাই করিস, যতদিন বাঁচবি ওই ফিঙ্গে ছেলেটার ভাত কাপড়ের কষ্ট চোখে দেখিস না।'

শুঁড়ির ছেলে মন্মথ, ধান পচানো মদের স্বাদ জেনেছে যখন, তখনও তার পরনে হাফপ্যাণ্ট ছিল। ধুতি পরতে শিখেছে তারও অনেক পরে—যখন কিনা শহরের স্কুলে থার্ড-ক্লাসে প্রমোশান পেয়ে ভূষণ সাহাকে ও কৃতকৃতার্থ করেছে। বার বার তিন কি চার বার থার্ড ক্লাসের চৌকাঠে হোঁচট খেয়েও আর এগুনো গেল না—ওদিকে আবার অন্যপথে সে অনেকদূর এগিয়ে গেছে—মা সরস্বতীর পিছিয়ে পড়া ডাকের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে টানছে মা লক্ষ্মীর অনুচরেরা। ইতি করে দিল মন্মথ বিদ্যের পাট। ধেনো মদের কৃপায় ষোল বছরের বেঁটে খাটো চেহারাটি তার ততদিনে হয়েছে নধরকান্তি। কুচকুচে কাল রঙের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে মাথার মাঝ বরাবর টেরি চিক্ চিক্ করে। সেই সাথে মিহি করে ছাঁটা গোঁফ। মুখ ভর্তি পান আর জরদা। চোখ দুটো সারাক্ষণই বেশ একটু লালচে। হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা আর বটতলা থেকে বই কিনে আনিয়ে মন্মথ পুরোদমে 'মন্মথ অপেরা'র মহড়া দিচ্ছে। সেই তখনই—মন্মথর বাবা ভূষণ সাহা মারা গেল। আর মারা যাবার সময় চারুর উপস্থিতিতেই ভূষণ সাহা মন্মথকে বললে, 'লাচগানে জীবন তুর কাটবে নাই, মন্মথা। উসব যত

ফচকে ছোঁড়ার কাজ। মরদ মানুষ তুই—বিয়া করিস নাই, বিটি সিটি নাই—। ডরটা তুর কিসের, বাপ! এই অবসর। যা করবি করে নে। বড় কিছু কর—উন্নতি হয় যাতে—, পাঁচজনার ভাল হয়, তুর নাম করে। তোর লেগে কিছু কম রাখি নাই। আর ই বেটাও থাকল—আমার বড় বেটা—চারু। ওর কাছে জ্ঞান-বুদ্ধি লিবি। তুর মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হুবেক নাই।'…

ভূষণ সাহা মারা গেল। মন্মথ জানত ধেনো মদের স্বাদ জুগিয়ে ওর বাবা ওর মনকে কচি বয়স থেকেই এমন এক পরম স্বাদের সঙ্গে পরিচয় পাতানোর সুযোগ করে দিয়েছে, যে স্বাদ মনোহরা। মনকে তা হরণ করবেই—সুখে সম্পদে, বিপদে আপদে। এ স্বাদ ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। চারুও ঠিক এই পরম স্বাদের মতই। প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত একটা বোধ আছে। এই বোধই তাকে নিজের মনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ান আর এক মনকে চিনতে, কাছে টানতে সাহায্য করে। মন্মথর বেলায় প্রথম কাজটুকু করল তার বাবা ভূষণ সাহা, আর দ্বিতীয়টুকু তার সহজাত বোধ। যে আলাপ, পরিচয়, ঘনিষ্ঠতাটুকু এতকাল উভয় পক্ষের মনে বাঁধ-আটকান জলরাশির মতন আবেগহীন যোগসূত্র হ'য়ে বিরাজ করছিল, এতদিন পরে সে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে জলের উদ্দাম স্রোত এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তীর আর তরী। ওদের বন্ধুত্ব হ'ল ডুবুডুবু—গলায়-গলায়। কাল, মোটা, বেঁটে মন্মথ—লিকলিকে, ফরসা, হাড়ওঠা চারুকে অন্তরের অন্তরতম সঙ্গী হিসেবে বাছাই করে নিল। 'মন্মথ অপেরা'র কুশীলবরা বাতিল হ'ল। তার বদলে চারু ধরল হারমোনিয়াম আর মন্মথ

ডুগি-তবলা। ভাটিখানার ছোট্ট ঘরে ওরা দুই বন্ধু জমে উঠল মদে, গানে, গল্পে।

ভূষণ সাহা ছেলেকে বলেছিল, ওর বয়স হয়েছে, বউ নেই ছেলেপুলে নেই—তিনকুলে যার এক পিসিমা আর দূর সম্পর্কের মামা ছাড়া কেউ নেই—সেই মন্মথ এই সময়টাই তার মনের ইচ্ছেমত কাজকর্ম করে বড় হতে পারে—প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, নিজেকে এবং আরো পাঁচজনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ছোট-খাটো একটা কীর্তি স্থাপন করার সাধ যে ছিল না মন্মথর এমনও নয়। সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। কখনো ভেবেছে শহরে দোকান দেবে, কখনো ভেবেছে ধানকল খুলবে, কখনো মেতেছে কাঠগোলা খুলবে বলে। কোনোটাই কিন্তু কাগজে কলমে হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আর কিছু করতেই তার ভাল লাগে নি। দূর সম্পর্কের মামাকে ভাটিখানার গদীতে বসিয়ে দিয়েছে। দিন শেষে একবার হিসেব দেখে ওই পর্যন্ত। কাজ ওর কিছুই নেই, কিছু করবে তাও মনে হয় না।

ভূষণ সাহা মারা যাবার পর চারু কিছুদিন পীড়াপীড়ি করায়—মন্মথ ভাটিখানার উল্টোদিকে পুকুরের গা লাগিয়ে এক শিবমন্দির তৈরি করে দিল। চারু বললে, এটা কি করলি? মন্মথ বললে, বাবা শিবঠাকুরকে বড় মান্যি ক'রত। থাক্ একটা শিবমন্দির। গাঁয়ের ছুঁড়ি-বুড়িগুলোর কাজে লাগবে।

চারুর দেবদ্বিজে তেমন ভক্তি ছিল না, মন্মথরও দ্বিজভক্তি ছিল না—তবে দেবভক্তি ছিল। ধর্মরাজের পূজোয় মোটা খরচ যোগাত, মেলা বসাত, যাত্রা জমাত। এই নিয়ে দু-বন্ধুতে মাঝে মাঝে হাতাহাতি হবার

উপক্রম ঘটত। ভারী জড়ান গলায় মন্মথ শুধু চীৎকার করত আর চারু দ্রুত শব্দ-বিন্যাসে নিজের যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করত, 'মন্দির, ধর্ম শিকেয় তুলে রাখ্, শালা। ভণ্ডামি ঢের হয়েছে, আর না। তার চেয়ে একটা পাঠশালা বসা, আপার প্রাইমারী কি মাইনর স্কুল কর্—কাজে দেবে।'

চারুর তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে মন্মথ মধুবনে এক পাঠশালা খুলে দিল। নিজের জমিতেই। ইটের গাঁথনীর সঙ্গে খড়ের চালা।

পাঠশালার ইটের গাঁথনী উঠছে যখন, তখন রানীগঞ্জ থেকে ইঁট বোঝাই ট্রাক নিয়ে মধুবনে আসত দেবল। আমাদের দেবল সিং। বালির গাদার কাছে ট্রাক দাঁড় করিয়ে মাঠে নেমে আসত দেবল। ইঁট খালাস হ'তে বহুক্ষণ লাগে। সেই ফাঁকে দেবল এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ভাঙ্গা, তোবড়ানো, মরচে-ধরা তু-ফালি টিন তুলে মেশিন-ঘরের কাছে রামশরণ মুড়ি, মুড়কি, ফুলুরির দোকান করেছে। সেখানে চা পাওয়া যায়; পান, বিড়ি, সিগারেটও। রামশরণের দোকানে ভাঙ্গা লোহার চাকার ওপর বসে দেবল সিং হাঁকে, 'কড়া করে চা লাগা, রামশরণ। তুধ জাদা দিবি।'··· রামশরণ গেলাসে চা দেয়। দেবল চা খেতে খেতে 'পল্ মল্' সিগারেট ফোঁকে। তখনই ওকে ভাল করে দেখে মন্মথ আর চারু। ছ'ফুটের ওপর লম্বা। দীর্ঘ তরুর মত দেহ। তামাটে রঙ। চওড়া হাড়ের গা মুড়ে পুরু মাংসপেশীর আস্তরণ। বিয়াল্লিশ কি—ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। হাত, পা, বুক—সব যেন পাথর। আশ্চর্য ওর মুখশ্রী। একটু লম্বাটে,

ঘন দাড়ির মাঝে ডুবে গেছে ওর চোয়ালের গভীর রেখা। থুতনির নিম্নাংশ চাপা; ঠোঁট দুটো পুরু, বসা নাক। দেবল সিং-এর কপাল যে খুব চওড়া তা নয়, পেছনের দিকে টেনে মাথার মাঝে ঝুঁটি-বাঁধার দরুন কপালের অনেকখানি অনাবৃত থেকে গেছে—মনে হয় চওড়া। আর ওর চোখ, মুখের তুলনায় বড় বেশি ছোট। চোখের মণিতে নীলাভ কৃষ্ণতা। দৃষ্টিতে ওর দীপ্তি নেই, দেখলেই মনে হয় নির্বোধ। তবু ওর সারা অঙ্গের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে চোখমুখ যখন নজর করা যায়, তখন অদ্ভুত লাগে ওকে দেখতে। ওর অলস মন্থর গতি, অল্প স্বল্প কথাবার্তা, মৃদু কণ্ঠস্বর—এ থেকে সহজে কিছু অনুমান করা মুশকিল। তবু ভাল করে ঠাওর করলে বোঝা যায়, বুনো মোষের মত ওর সাধারণ অবস্থাটা আত্মগত। ওই যে অলস চাল, ঘোলাটে দৃষ্টি, থমথমে বোকাটে মুখ—এ সমস্তই যেন গভীর জলের ওপরকার স্থৈর্যের মতই বিরাট একটা প্রাকৃতিক ছলনা। যে কোনো সময়ে ওই মিথ্যে ছলনাটুকু সরে যেতে পারে, নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেতে পারে।

দেবল সিংকে দেখে মন্মথ কি চারু প্রথমটায় কেউ অত অনুমান ক'রতে পারে নি। লোকটার যে প্রচুর শক্তি আছে সেটা চেহারা দেখেই বুঝতে পারত। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মাথা ঘামানোর কোনো কারণই ঘটে নি। কারণটা ঘটল সেদিন,—স্কুলের দেওয়াল তোলা যখন প্রায় শেষ; খড়ের ছাউনী দেবার আগে কাঠকুটো আসতে শুরু করেছে। মন্মথ কাজ দেখতে রোজই আসে; কাজের ছুতো করে বেশির ভাগ দিন পালিয়ে আসে চারুও। কাছেই চারুর বাড়ি। তখনও বকুল আসে নি চারুর

ফুটিয়ে। ঘরে বসে এন্তার চা খায় দুজনে, বিড়ির টুকরো ছিটিয়ে ঘর ভরে দেয়। এমনি একদিনে—রাধানাথপুর অফিস গুদাম থেকে ভারী ভারী কাঠ বোঝাই করে মোষের গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছিল চুন-বালির গাদার কাছেই। মোষের গাড়িটা যেখানে দাঁড়াল—জায়গাটা বড়ই এবড়ো-খেবড়ো। তার ওপর মাস দেড়েক যাবৎ লরী এসে, গরুর গাড়ি যাতায়াতে, মিস্ত্রী-মজুরদের চুনবালি ইটের ভাঙ্গাভাঙ্গি আর মেশামিশিতে সারা জায়গাটাই প্রায় গর্ত হয়ে গেছে—উঁচুনীচু এত যে বলা যায় না। গাড়ি থামিয়ে হরবিলাস নেমে এল। গাড়িও হড়হড় করে ক' পা গড়িয়ে নেমে গেল নীচে। হরবিলাস মোষ পিটিয়ে আবার ঠিক মতন জায়গায় গাড়ি রাখল। আবার সেই গড়িয়ে আসা। বলতে কি, জায়গাটা যে বেশ খানিকটা ঢালু হরবিলাস বুঝতে পেরেছিল। ভাল দুটো ইট বেছে নিচ্ছিল চাকার তলায় ঠেকা দেবার জন্যে। তৃতীয়বার গাড়িটা সামনের দিকে ক' হাত এগিয়ে হরবিলাস যখন চাকার তলায় পিঠ-মাথা গলিয়ে ইট লাগাচ্ছে, মোষ দুটোর একটা হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টান দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি তো গড়িয়ে নামলই, সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে হরবিলাসের দিকে চাকা ভেঙ্গে তার অর্ধেক দেহটা ঢেকে ফেলল। চোখের পলকে কাণ্ডটা ঘটে যায়। কুলী-কামিনের দল চীৎকার করে উঠল। কাঁচা দেওয়ালে পেন্‌সিল দিয়ে তার টানার হিসেব করছিল চারু, ছুটে বাইরে এল, হাজরি-খাতার হিসেব ফেলে রেখে এসে দাঁড়াল মন্মথ। হরবিলাসের মর্মান্তিক চীৎকার তখনও ভাসছে। দু-চার জন এগিয়ে এসে হাত দিল তখুনই। কিন্তু রেল লাইনের স্লিপার দেওয়া ওই বিরাট ভারী কাঠগুলো এমনভাবে ছিটকে নীচে

নেমে এসেছে, আর চাকাটা ভেঙ্গে গাড়িটা ডান দিকে কাত হয়ে এমন বেকায়দায় পড়েছে যে, গাড়ির পেছনে অমন আট-দশটা হাত লেগেও সেই শোচনীয় অবস্থার মোড় ফেরাতে পারল না। দেবল সিং চায়ের গেলাস হাতে এসে দাঁড়াল ঠিক সেই সময়। এক পলক দেখে নিয়ে ও গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চট্‌ করে ভাঙা চাকার তলায় ঢুকে গেল। তারপর মুখ নীচু করে হামাগুড়ি দিয়ে বসল। পিঠের ঠেকা দিয়ে উঁচু করে ধরল ভেঙে পড়া পাশটা। অন্যান্য যারা ছিল—সেই ফাঁকে হর-বিলাসকে টেনে বের করে নিল। আস্তে আস্তে গাড়ি নামিয়ে নিজের দেহটাকেও বের করে নিল দেবল। জোর জখম হয়েছে হরবিলাস। ওকে নিয়ে চারুরা ছুটল হাসপাতালে।

সেই থেকে আলাপ দেবলের সঙ্গে চারু আর মন্মথর। রতনে রতন চিনল। রামশরণের চায়ের দোকানে আর নয়, চারুর ঘরে দেবল এসে বসে চা খায়। কদিন যেতে না যেতেই মন্মথদের ভাটিখানার টান লাগল দেবলের। প্রথম দিনেই বোতল সাবাড় করার পাল্লা দিয়ে দেবল প্রমাণ করল, মন্মথ শুঁড়ির বাচ্চা হয়েও ওর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। নেশায় চুর হয়ে মন্মথ লুটিয়ে পড়ে, চারু মুখর হয় কিন্তু দেবল নির্বাক। বয়লারের মত সমস্ত দাহন থাকে ওর ভেতরে—বাইরে তার হাড় মাংসের কঠিন কাঠামো অন্তরের সমস্ত উত্তাপকে ঢেকে রাখে বয়লারের পুরু ইস্পাতের খোলের মতই।

দিনে দিনে পরিচয় গাঢ় হয়, আলাপ আলাপনে হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ। দেবল তার কাহিনী বলে। এই কয়লাখনি অঞ্চলেই সে মানুষ। মার্টিন

কোম্পানীর ঘুষিক মুসলিয়া কোলিয়ারীতে কাজ করতো তার পিতাজী—হীরা সিং। যে কাজে গায়ে সিংহের শক্তি ধরতে হয়, সেইসব কাজ। ভারী লোহার মেসিন তোলা, রোপ খোলা, কামারশালায় লোহা পেটা—এমনি কত কি। যুবক বয়সেই হীরা সিং এখানে চলে আসে। সেই থেকে বরাবরই হীরা সিং-এর জীবন কেটেছে এখানেই। ওর বাপ আশে পাশের এক গতর-পেশা সবল সুস্থ গাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করেছিল! শুনেছে তার মা নাকি জাতে ছিল বাউরী। গাঁয়ের লোক কুৎসা রটিয়েছিল তার মা'র নামে। বাপ তার তাতে বিগড়ে যায় নি। দেবল সিং-এর মনে আছে ওর মাকে একটু আধটু। মোটা মোটা হাত, একরাশ চুল, গোলগাল মুখ। ওর মার নাম ছিল রম্ভা। দেবলের বয়স যখন ছ' বছর কি সাত বছর বড় জোর—ওর মা মারা গেল বসন্ত রোগে। তারপর দীর্ঘ তের বছর ওর পিতাজীর কাছ ছাড়া হয় নি দেবল। বড় ভাল-বাসতেন ওকে ওর পিতাজী। দেবলকে একটু আধটু লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছে ছিল ওর বাবার। মাথায় গোবর পোরা তার। কিছুই ওর মনে থাকত না, পড়াশোনাও করত না দেবল। এ জন্যে বাপের কাছে মাঝে মাঝে কি কম মার খেয়েছে। তবু কোনো ফল হয় নি।

চারু দেবলের কথা শুনে বলত, 'হাঁরে, তুই তোদের ভাষা বলতে পারিস?' দেবল উত্তর দিত, 'দু-চারটে পারি। কার কাছে শিখব বল্। বাচ্চা থেকেই বাঙলা শুনছি, বলছি। আমি বাঙালী।'...মন্মথ বললে, 'তবে যে চুল দাড়ি রেখেছিস—হাতে তোর লোহার বালা—?' দেবল হাসে, 'বাবা রেখেছিল। আমায় রাখতে বলেছে। ব্যাস্, আর কিছু

জানি না—ধর্মে মানা তবু আমার বাপ মদ খেত। আমি মদ, বিড়ি, সিগারেট সব খাই।'

মন্মথ, চারু আর দেবলের একাত্ম বন্ধুত্ব যখন গভীরতম হয়ে উঠেছে তখনও কিন্তু দেবল পাথরচটিতে থাকত না। থাকত পাঁচমাইল দূরের এক কোলিয়ারীতে। কনট্রাকটারের লরী চালাত। পাথরচটির অপর দুই বন্ধু দেবলের দূরাবাসের জন্যে কি অস্বস্তি যে ভোগ করত কি বলব। চারু বলত, 'এখানে চলে আয়।' মন্মথ বলত, 'খোঁজ দেখ্ না একটা লরীর, আমি কিন্ছি—তুই চালা।' দেবল উত্তর দিত, 'দাঁড়া আসব। সাইকেল থাকতে পাঁচ মাইল পথ আর দূর কোথায়!' এমন সময় এক আকস্মিক ঘটনা ঘটে দেবলকে বরাবরের জন্যে টেনে আনল পাথরচটিতে। সেই ঘটনাটার কথাই বলি।

রানীগঞ্জ থেকে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে ফিরছিল দেবল লরী চালিয়ে। কালিপাহাড়ীর কাছাকাছি আসতেই একটা দৃশ্য ওর চোখে পড়ল। রাস্তার এক পাশে পাথরচটি কোলিয়ারীর মালিক অ্যাশলে সাহেবের গাড়িখানা দাঁড় করান। অ্যাশলে সাহেব রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছেন—আর তাঁকে আট-ন'জন কুলি মিলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের ভঙ্গী এবং বচন শুনে স্পষ্টই বোঝা যায় অ্যাশলে সাহেবকে আক্রমণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। গাড়ি থামিয়ে স্টার্ট-দেওয়ার বিরাট লোহার হ্যাণ্ডেলটা হাতে করে দেবল চোখের পলকে নেমে সাহেবের পাশে এসে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় দলের মধ্যে থেকে কে একজন থুতু ছুঁড়ল। থুতুটা মুখে এসে ছিটিয়ে পড়ল দেবলের। মুহূর্তের মধ্যে দেবলের হাতের হ্যাণ্ডেলটা এমন এক সাংঘাতিক

অবস্থার সৃষ্টি করল, যা দেখে অ্যাশলে সাহেবেরও চক্ষুস্থির! ক'টা কুলি পালিয়েছে—ক'টা রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। পীচের রাস্তায় রক্তের রঙ ধরে গেছে। তিলমাত্র দেরি না করে অ্যাশলে সাহেব নিজের গাড়ির পেট্রল ট্যাঙ্ক খুলে খানিকটা পেট্রল উঠিয়ে গাড়িতে ছিটিয়ে দিলেন। জ্বালিয়ে দিলেন আগুন। তারপর এক হেঁচকা টানে দেবলকে লরীতে টেনে তুলে নিজেই ড্রাইভ করে সোজা চললেন শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের বাঙলোয়।

সেই থেকে দেবল পাথরচটিতে। রক্তপাতের মামলাকে বুদ্ধির জোরে বানচাল করে দিয়ে অ্যাশলে সাহেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কোম্পানীর টাকায় নতুন মডেলের ফোর্ড গাড়ি এল। দেবল এল সাহেবের শোফার রূপে। মাইনে পাবে কোম্পানী থেকে। রাধানাথপুরের নিজের বাঙলোর আউট-হাউসের দু-খানা ঘর তিনি ছেড়ে দিলেন দেবল সিংকে। এর পর আর কি বাকি থাকতে পারে!

পূর্ণ হ'ল ষোলকলা। কোথাও যদি বা এত দিন কোনো ফাঁক থেকে থাকে, মিইয়ে গিয়ে থাকে সুর—সে ফাঁক এবার ভরাট হ'ল; বেসুরো গলা সুর ফিরে পেল। তিন বন্ধুর তিনটি বিচিত্র দেহ ভাটিখানার কোণের ঘরের দেওয়ালে দীর্ঘতর ছায়া বিস্তার করে গভীরতর করতে লাগল ওদের উত্তপ্ত বন্ধুত্ব। কথা, হাসি, গান, গল্প আর অজস্র অশ্লীল চীৎকারের জালে জালে যে জমাট বন্ধনীটুকু গড়ে উঠল, পাথরচটির লোক সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি হানতে লাগল।

এমনি করেই কাটছিল দিন। হঠাৎ একমুখো জলের স্রোত বাধা পেয়ে পাক খেল মাত্র বছর দুয়েক আগে—চারু যখন বকুলকে এনে তুললে তার কুটিরে। নতুন খেলনা পেয়েছে যেন ওরা। নতুন নেশা। তিনজনে সেই খেলা, সেই নেশা নিয়ে মত্ত। বকুল বাঁধবে চুল, মন্মথ হাত বাড়ায়, তেঁতুল বিছের মতন বিনুনি করে খোঁপা বেঁধে দেবে সে বকুলের। বকুল শংকিত হয়ে ওঠে, চুল সামলাতে দিশেহারা হয়ে দৌড় মারে দালানে। বকুল খাবে পান, দেবল লাফ দিয়ে উঠে পানের বাটা টেনে নেয়, চুনের পরিমাণ চতুর্গুণ করে পান সাজে, কার সাধ্য দেবলের সামনে সে পান না খেয়ে পালাবে। ফলে বকুলের ত' জিভ গাল পুড়ে যায়ই—মন্মথ-চারুও থু থু করতে থাকে। আলতা পরবে বকুল—চারু তরল আলতার শিশি টেনে নেয়, বলে, 'দাও তোমার চরণ—এ্যয়সা ফাইন করে রাঙিয়ে দেবো, হাঁটলে মেঝেতে ছাপ ধরে যাবে।' সসঙ্কোচে বকুল পা টেনে জড়সড় হয়ে থাকে—'ছি, ছি, আমার পায়ে হাত দেবে কি! পাপের ভাগী করতে চাও আমায়?...' পাপপুণ্য নয়, বকুলকে ওরা ওদের মতনই এক সাধারণ সুখ, দুঃখ, হাসি, হট্টগোল সবকিছুরই ভাগী করতে চেয়েছিল। তার ফলে চারুর অন্তঃপুরের আবহাওয়া প্রায় ভাটিখানার আড্ডাঘরের মতন হয়ে উঠছিল দিন দিন। বাইরের পাঁচ কানে, পাঁচ চোখে জিনিসটা বিসদৃশ ঠেকবে এ আর আশ্চর্য কি! বিশেষ করে বকুলের অতীত ইতিহাসটা সকলেই যেখানে কম বেশি জানে—সেখানে চারুর অন্তঃপুর সংক্রান্ত নানান কথা যে মুখরোচক হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এ ত' স্বাভাবিক। তিনজনেরই কানে যায় কথাগুলো। বকুলেরও। মনে যাই হোক্ মুখে কিছু বলে না

বকুল। চুপ করে থাকে। চারুও অদ্ভুত। খাওয়ানো-পরানো হৈ-হুলোড ছাড়া আর যেন কোনো দায়ভার নেই তার বকুল সম্পর্কে।

অবশেষে এ খেলাও ভাঙল। হয়তো সেই প্রথম ওরা মনে মনে অনুভব করেছিল—সবকিছুই আর মনের খেয়ালে করা চলে না। ওদের বয়স হয়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে। সব জায়গায় সব যেমন মানায় না, তেমনি ওদের তিনজনের বয়স এবং বুদ্ধির সঙ্গে বকুল ঠিক মানাচ্ছে না। বকুল তাদের বন্ধুর বউ, বাড়ির বউ—তার সংসার, তার সুখ, তার সম্মান বজায় রাখতে হ'লে বকুলকে দুকুলই রাখতে হবে। ওদের মতন ছন্নছাড়া বেপরোয়া হ'তে সে পারে না। পাঁচজনের মাঝে নিজেকে যেতেও হবে, আবার ডাকতেও হবে পাঁচজনকে। খাপ খাইয়ে, মানিয়ে, মিলে-মিশে তবেই না চারু-বউ সুখ পাবে, শান্তি পাবে।

মন্মথই একদিন ভেবে চিন্তে বলল, 'বকুল, কাল থেকে তুমি আমাদের ভাদ্দর বউ! আমরা, মানে—এই আমি আর দেবল, আমরা তোমার ভাসুর।'

'সে কি?' চারু মুড়ির থালা ফেলে দিয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল, 'ভাসুর?'

'গুরুজন!' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলে মন্মথ, 'আমরা কাল থেকে বড়জনের মত থাকব।'

'এতদিন কি ছিলে?' প্রশ্ন করলে বকুল, কলাই করা মগে চা ঢালতে ঢালতে, মুচকি হেসে।

'কি ছিলাম! কেনে আমাদের পারা—' মন্মথ কথা হারিয়ে ফেলল,

সাবেকী ভাষা ভুলে গেল। মুখ চোখ ফুলিয়ে একেবারে বোবা। চারু হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'আমরা ছিলাম এক বাগানের তিনটি মালি, এক মালার তিনটি মালাকার, বুঝলে সখি। তিনটি বাতির একটি প্লাগ্ পয়েণ্ট ছিলে তুমি। এবার মাইরি একা-একা। ওরা বাতিল হ'ল।'

'তাই নাকি?' বকুল মন্মথদের দিকে চাইল।

মাথা নাড়ল মন্মথ। দেবল তার পিকিনিজ্ কুকুরের গা-ভর্তি নরম তুলোর মত লোমে হাত ঘষতে থাকল চুপচাপ।

'হঠাৎ এ ব্যবস্থা কেনে?' বকুল জানতে চায়।

'দশজনে নিন্দে রটায়।' গম্ভীর স্বরেই বললে মন্মথ, 'চারুর বউকে কেউ কিছু বললে খারাপ লাগবে নাই, আমাদের? এ শালা দেশের লোকগুলাই হারামজাদা। মারো ধরো—তবু শালারা ফুস্থর-ফাস্থর ছাড়তে লারবে। কাজ কি তোমার মন্দ কথায়। ঘরের বউ তুমি। সম্মান লিয়েই থাকো।'

মন্মথর কথার পর আর কেউ কথা বলে নি। বলতে পারল না। থমথমে হয়ে উঠল মধুবনের সেই ছোট্ট ঘর, সেই সূর্য-ডোবা সাঁঝে। বকুল বুঝি চুপি চুপি আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল সেদিন। তবু সেদিন সেই সবচেয়ে সুখী হয়েছিল। সঙ্গী হারানোর দুঃখ যত না বেজেছে বকুলের, তার চেয়ে শতগুণ সুখী হয়েছে সে—স্বস্তির কথা ভেবে। ঠিকই তো, মন্মথ ঠিক কথাই বলেছে। এবার থেকে আর কেউ বেঁকা চোখে চাইবে না, ঠেস দিয়ে কথা বলবে না, পান খাওয়া ঠোঁটের কদর্য হাসিতে বকুলের অতীত জীবনের ইঙ্গিত জানিয়ে বর্তমানকে একসাথে গেঁথে দিতে চাইবে না।

স্বামী থাক্ তার, স্বামীর সংসার থাক্—থাক্ তার নিজস্ব অজস্র সুখ, দুঃখ, ব্যথা। সে যে অনেক শান্তির। অনেক সম্মানের।

মধুবনের ঘর মধুহীন করতে মন্মথ আর দেবল চলে আসে নি। মধুসিক্ত করতেই ওরা চেয়েছিল। তা বলে এমন নয় যে ভাটিখানা থেকে চারু বাদ পড়বে। চারু আসবে, রোজ তার আসা চাই, বসা চাই—। সবই সেই আগের মত, খালি তফাৎ এই যে, বন্ধুদের নিয়ে তার জীবন ভাটিখানার ঘরেই মুখরিত হোক। আর ঘরের জীবন থাক্ ঘরে, বকুলের কাছে। দু-জগত আলাদা। এ জগৎ ওখানে হাত বাড়াবে না, ও জগতের স্নিগ্ধ আলো যেন এ জগতের নেশা না ভাঙ্গায়।

'বকুল পর্ব' শেষ হ'ল! আবার সেই আগের মতই জীবন। সেই মাঠ, ভাটিখানা, শহর, সিনেমা, যাত্রার আসর, গান, গল্প, হাসি, চীৎকার, গালিগালাজ।

এমনি করেই দিন কাটছিল। কাটল প্রায় দু' বছর। তারপর আবার একদিন উত্তর-মুখো উজান-টানা নৌকোয় লাগল দক্ষিণের হাওয়া। নৌকা বিগড়োল। তিন দাঁড়ি মিলে দাঁড় ধরল কষে। তবু নৌকা কি বাঁচল, না ডুবল, না ভাসল—দাঁড়ি তিনজনে দাঁড় টানল, না ডুবল জলে, সাঁতার কাটল, না হাত গুটিয়ে থাকল বসে—তারই কথা।

তখন শীতকাল।

পৌষের হাড়-কাঁপানো হাওয়া বইছে সকাল-সন্ধ্যে। সারা রাতের জমা কুয়াশা কাটতে বেলা গড়িয়ে যায়, ওদিকে আবার সূর্য ডোবার আগে থেকে কুয়াশা আর ধোঁয়া জমতে থাকে পাথরচটির মাঠে ঘাটে, 'পিট্' আর চিমনির গায়, পলাশবন আর শিশু দেবদারুর পাতায় পাতায়। বিকেল ছ'টায় পাওয়ারহাউসের তীক্ষ্ণ কর্কশ সিটিটা বেজে ওঠে। পাথরচটির পথ-ঘাট তখন ধোঁয়া-কুয়াশার শ্বেতজালে জড়িয়ে গেছে, অন্ধকারে আবছা হয়ে এসেছে কয়লা-কুঠির ঘরবাড়ি। পাথরচটি, মধুবন আর রাধানাথপুরের রাস্তায় তখন সাইকেলের ঘন্টি বাজে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভারী গলার স্বর শোনা যায়; কানে আসে খুশীর দমকা হাসি, ঘরোয়া কথা, দু'চার কলি টুকরো গান। এরই মাঝে কখনো কখনো মাদলের বোল আর বাঁশির সুর ছড়িয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে যায় সাঁওতাল কুলি-কামিন। আগুপিছু দলকে চমক দিয়ে সেন সাহেবের টু-সিটার হিলম্যান গাড়িটা হেড লাইটের আলোয় পথ ভিজিয়ে দেয় ক্ষণেকের জন্যে, মুখার্জী সাহেবের মোটর বাইক বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে ধাবমান অ্যালসেসিয়ান

কুকুরের মত ছুটে বেরিয়ে যায়। সকলেই কুলায়-ফেরা বিহঙ্গের মত গৃহগত প্রাণ।

শীতের এই সময় এসো একবার ভাটিখানার কাছে। দক্ষিণের ক্ষেত-গুলো ফাঁকা মাঠ হয়ে পড়ে আছে কাটা ধানের গোড়া বুকে করে। উত্তরে পুকুরের জল পদ্মপাতায় ছাওয়া। শিবমন্দিরের দরজার কাছে সকাল বিকেল আগুন জ্বলে, হাত পুইয়ে নিয়ে যায় পথ-চলতি লোক।

ভাটিখানার সামনেই মস্ত মাঠ। এই মাঠেই হাট বসে রবিবারে; জম-জমাট হাট। শহর থেকে সওদা নিয়ে আসবে ব্যাপারীরা, আসবে মনিহারী ফেরিওয়ালা। দামোদর নদী পেরিয়ে দূর দূর গ্রাম থেকে আসবে নিটোল-স্বাস্থ্য সাঁওতাল মাঝি-মাঝিন। মাথায় টাটকা শাক সব্জি—তখনো শিশির ভেজা, মাটি-গন্ধে মাখামাখি। কেউ বা আসে হাতে মুরগী ঝুলিয়ে।

হাট জমতে জমতে দুপুর। মাঠটা তখন লোকে লোকারণ্য, দর কষাকষি আর ওজনের ডাক কষায়, চীৎকারে গুলজার।

বিকেলে, পড়তি বেলার বাজার। তল্পিতল্পা বাঁধা আর হিসেব গোনার পালা তখন ব্যাপারীদের, ভিড়টা ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণের ফাঁকা ক্ষেতগুলোর আলে আলে। এখানে জমেছে মুরগী লড়াই। পেতলের বড় বড় বাটি ভর্তি তাড়ি নিয়ে সাঁওতাল, বাউরী সব বসে গেছে আল-ধারে। মুরগী লড়াই-এর প্রতি পর্বে তাদের গগনভেদী চীৎকার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কোনো প্রেমিক সাঁওতাল যুবক হয়তো সদ্য কেনা, লাল-সালুর-পাড় দেওয়া মার্কিন কাপড়ের জামা পরা যুবতীটির পানে সোজা-চোখে চেয়ে

চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে মিঠি-মিঠি। মাদলের বোল দিয়ে সে ছিনিমিনি প্রেমে চুমকি কেটে দিচ্ছে আর কেউ হয়তো। এদিকে মুরগী লড়াই নিয়ে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেছে দু'দলে। নেশায় বুঁদ ওরা; চেল্লাচেল্লি, মাথা ফাটাফাটি করতে কসুর করে না। তারই মধ্যে এক রসিক কবিয়াল আলুথালু কিশোরীর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে গান ধরে :

ঝিঙা সবুজ

পটল সবুজ

সবুজ আহা কদু…

চুল কাল

বরণ কাল

(ছুঁড়ির) বুকে আছে মধু…

দেখতে দেখতে বিকেল শেষ হয়ে আসে, কুয়াশা নামে, হাওয়া দেয় হু হু। ভিড় ফাঁকা হতে সুরু করে একটু একটু ক'রে। শিবমন্দিরের ঘণ্টা বেজে ওঠে—ককিয়ে ওঠে পাওয়ারহাউসের সিটিটাও রোজকার মত।

একটি দুটি বাতি জ্বলল এখানে ওখানে। হাট, মাঠ ফাঁকা। ভাটিখানার দালানে ধেনো মদের খদ্দের আছে ছিটে-ফোঁটা। বেহুঁস কেউ হয়তো অন্য কারুর গলা জড়িয়ে বেভুল বকছে।

সমস্ত দিনের মুখর লীলা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কেবল তাড়ির গা-বিড়োনো গন্ধে হাটের বাতাস ভরা থাকে আর আকাশের তারা জ্বলে রোজকার মতন।

মাঘ মাসের প্রথম হপ্তার হাটটাই সেবার কিন্তু জমেও জমল না।

পৌষ সংক্রান্তির মেলা ফিরতি ঝড়তি-পড়তি মাল নিয়ে ব্যাপারীরা এসেছিল অনেকে। ঝুমঝুমি আর ঘণ্টা বাজিয়ে খদ্দের ডাকছিল ঘুঘু মনিহারী দোকানিরা, তবু খরিদ্দাররা কাছে ঘেঁষল না কেউ। চাল, নুন, ডাল মশলার দোকানে মানুষ-জনের পা পড়েছিল, শাকসব্জিগুলো সস্তায় কেটে গেল।

কিন্তু মুরগী লড়াই আর জমল না। ভাটিখানার সেই দক্ষিণের ফাঁকা ক্ষেতে দুপুর থেকেই ছ'সাতটি গরুর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তখনও ঠেকা দিয়ে দিয়ে গাড়িগুলো সোজা করে রাখা। ছেড়ে দেওয়া গরুগুলো সামনের ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছে।

এক একটা করে গাড়ির মাল খালাস হচ্ছিল। এখানে ওখানে জমে উঠছিল কাঠ, গোঁজ, দড়ি, তেরপল, লোহার শিক, তাঁবু, তুবড়োনো তাবড়ানো লোহার বাক্স।

ভিড়টা সবচেয়ে বেশি জমেছে ভাটিখানার দক্ষিণ-মুখো আটচালাটায়। সেখানে একটা বড় খাঁচা নামানো রয়েছে, ছোট ছোট খাঁচাও রয়েছে গুটি দুই। বড় খাঁচাটার একপাশে মোটা মোটা লোহার শিক। ছোট খাঁচাগুলোর একটাতে শিক গাঁথা আছে—তবে তেমন মোটা মোটা নয়। আর একটাতে শুধুই তারের জাল।

ভিড় ভেঙ্গে পড়েছে এইখানে, এই খাঁচা তিনটের চারপাশে। বেঁটে মতন একটা লোক ছুটে এসে মাঝে মাঝে দু'হাত দিয়ে ভিড় সরিয়ে দিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার যে কে সেই।

বড় খাঁচাটাতে একটা বাঘ। ছোট খাঁচার যেটাতে শিক দেওয়া তাতে

আধ ডজন বাঁদর বাচ্চা। অন্য যেটা জালে ঢাকা, তাতে এক বিরাট-দেহ সাপ; পাকিয়ে পেঁচিয়ে পড়ে আছে।

খিদের জ্বালায় বাঘটা মাঝে মাঝে হাঁক দেয়, বাঁদরগুলো মুখ খিঁচোয় প্রাণপণে তবু অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে দর্শককুল দাঁড়িয়ে থাকে, উৎকট বোট্‌কা গন্ধ শোঁকে আর বাঁদরামি করে। জালে ঢাকা খাঁচাটার কাছে ভিড় নেই। উঁকি দিয়েই সরে আসে সকলে। সাপের জাতকুল নিয়ে তর্কটা হয় বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে, সাপের কাছ থেকে সরে এসে। সাপের গড়ন-গাড়ন বিচার করে কেউ বলে পাহাড়ী, কেউ বলে অজগর, কেউ বা অন্য কিছু।

কিন্তু কি হবে এই বাঘ, বাঁদর আর সাপ?

উল্কি কাটা সোয়েটার গায়, পা গুটনো পাতলুন পরা সেই বেঁটে লোকটা ভিড়ের মধ্যে আবার এসে দাঁড়ায়। হাতে তার একগাদা লাল কাগজ। ভাত ছিটোনোর মতন ছিটিয়ে দিয়ে গেল কাল-হরফে গা-চুপ্‌সানো সেই লাল লাল পাতলা কাগজগুলো। কাগজ নিতে হুড়োহুড়ি। পড়ার সময় গলার জোর পরীক্ষা।

"গ্র্যাণ্ড লিল্‌লা সার্কাস।...'আসুন, আসুন, বিস্ময়কর খেলা দেখিয়া মোহিত হউন। চমকপ্রদ বিশটি খেলা। মানুষ ও বাঘে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। বিষধর সর্পের সহিত সুন্দরী যুবতীর বিস্ময়কর আলিঙ্গন। তারের উপর নৃত্য। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চক্ষু বন্ধ অবস্থায় তরবারি চালনা। ইহা ছাড়াও দশটি যাদুর খেলা, দোলনার নাচ, হাস্য, কৌতুক। আজই খেলা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করুন।' টিকিটের মূল্য......। ইত্যাদি"

হ্যাণ্ডবিলের লেখাগুলো পড়া শেষ হতে না হতেই চোখের সবটুকু জোর দিয়ে ছবিটা দেখা।

ছবিটা কি ছাই পরিষ্কার করে উঠেছে? কালিতে ধেবড়ে আছে খানিকটা জায়গা। তবু জোর চোখে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে যা অনুমান করা গেল তাতেই পাথরচটির লোকজনের চোখ কপালে ওঠার যো। অত্যন্ত রসালো অথচ অকল্পনীয় কোনো জিনিসের শতাংশের একাংশ দেখায় যে এত উত্তেজনা আছে কে জানত! প্রায় স্বর্গ দেখার মতনই অভিভূত হয়ে ওরা দেখে কালি-কলঙ্কিত একটি অর্ধবসনা নারী-তনু, পাকে পাকে তার সাপ জড়ানো।

অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ জাগায় এই ছবি। হ্যাণ্ডবিল আর বাঘের খাঁচাকে কেন্দ্র করে রোমাঞ্চের উত্তেজনাটা আরও বাড়তে থাকে। ভাটিখানার মাঠে ভিড় ভেঙ্গে পড়ে, মুখে মুখে সংবাদটা রটে যায়, তিল হয়ে ওঠে তাল।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে নাগাত ছোট ছোট দুটো তাঁবু খাটান শেষ হয়। পেট্রম্যাক্স জ্বলে ওঠে একটায়। ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে মাঠ। পাথরচটির ছেলে বুড়ো, জোয়ান মদ্দরা একে একে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির পথ ধরে রাত পোয়াবার অপেক্ষা নিয়ে। নানান মুখে নানান মন্তব্য। কেউ বলে, ঘোড়ার খেলা হবে কি করে, ঘোড়া কই? কেউ বর্ণনা দেয় সেই সর্পালিঙ্গনরতা তরুণীর।

ধোঁয়া কুয়াশার অন্ধকারে ভাটিখানার ক্ষেত ধীরে ধীরে কোথায় যে হারিয়ে যায়, শুধু অনুজ্জ্বল একটি তারার মতই জ্বলতে দেখা যায় পেট্রম্যাক্সটা দূর থেকে।

সন্ধ্যে উতরে গেছে।

হন্তদন্ত হয়ে চারু আসে মন্মথর খোঁজে। বলা কওয়ার দরকার হয় না, বাধানিষেধের বালাই নেই। সটান ওদের আড্ডাখানার ভেজান দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ে চারু। পা বাড়িয়েই ও পাথর। চোখের পলক আর পড়ে না। ফাঁক হয়ে থাকে ঠোঁট দুটো। মনেই থাকে না জলন্ত বিড়িটা কখন অসাবধানে জামার সঙ্গে ছুঁইয়ে ফেলেছে।

ঘোর ভাঙ্গে মন্মথর গলার স্বরে।

'হাঁ করে নজর দিচ্ছিস কি, মুখ দিয়ে তোর মাছি গলে যাবে যে রে। ফেল, ফেলে দে বিড়িটা; জামাটা লঙ্কাদাহন হয়ে গেল!'

জামার ওপর নজর পড়ল চারুর। বিড়ি ফেলে পোড়া জায়গাটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলল।

বেচারা চারু; মুখ তখনও তোলে নি, কাঁচ ভাঙার মতন তীক্ষ্ণ তরল একটা হাসির ঢেউ এসে আবার ওকে হকচকিয়ে দিল।

বোকার মতন মুখ তুলে চারু যখন সোজাসুজি তাকাল, চুলের ফাঁকে বকের পালক গোঁজা সেমিজ পরা মেয়েটা তখন গলগলিয়ে হাসতে হাসতে পাশের সঙ্গিনীর গায়ে ঢলে পড়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ চারু দৃশ্যটা দেখেই গেল শুধু। মনে মনে শাপান্ত করতে লাগলো ওর চোখের দৃষ্টিক্ষীণতাকে।

'এখানে আয়, চারু'—মুরুব্বী চালে ডাকল মন্মথ, 'আয়, বোস্। কোন্ যুগে খবর পাঠিয়েছি তোর কাছে, এলি কিনা রাত কাবার করে?'

ধীরে ধীরে মন্মথর পাশে গিয়েই বসল চারু। বসেই অনুভব করতে

পারল, যে জোড়া তক্তাপোশের ওপর নোঙরা চিট সতরঞ্চি বিছিয়ে দিনের পর দিন তারা বসে এসেছে, আজ ঠিক সেইভাবে বসে নেই। সাদা ধবধবে একটা চাদর বিছান রয়েছে আজ। আর বলতে কি আসনটাই শুধু নতুন নয়, আয়োজনটাও লোভনীয়। গোটা দুয়েক কাঁচের প্লেটে ডিম ভাজা, মাংস, পিঁয়াজ পাশে গলা-খোলা বিলিতি মদ। চারুদের ভাষায় 'দ্বিতীয় পক্ষ'।

মেয়েটা ততক্ষণে হাসি থামিয়ে সোজা হয়ে বসেছে। মন্মথ চোখ নাচিয়ে বলল, 'দেখেছিস এদের? ওই যে ওই স্যাণ্ডোর মতন ষণ্ডাগুণ্ডা লোকটা ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে আছে, ওর নাম, আয়ার। পাশে ওই কার্তিক ঠাকুরটির নাম, স্যামসন। হাসির ফোয়ারা তুলে যে এতক্ষণ গড়াগড়ি দিল, ওরই নাম লীলাবতী। লীলাবতী বাঙালী। লীলাবতীর পাশে যে মেয়েটি বসে, ও হচ্ছে কৃষ্ণা। বেড়ে চিকন চাকন চেহারাটি! তারের ওপর নাচে, মাইরি। ঠিক যেন পেখম-তোলা ময়ূর তখন।'

চারু সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

মন্মথ আয়ার-গোষ্ঠীর পানে তাকিয়ে বলল, 'যার কথা বলছিলাম—এ আমার সেই আর-এক বুসুম ফ্রেণ্ড—প্রাণের দোস্ত চারু। কোলিয়ারীর হেড ইলেক্ট্রিসিয়ান। কাল সার্কাসের তাঁবুতে, চারুই লাইন টাইন টেনে ইন্দ্রসভা বানিয়ে দেবে। না কি রে চারু?' কথা শেষ করে হাসি হাসি মুখেই মন্মথ মুখ-খোলা বিলিতি মদের বোতলটা এগিয়ে দিল।

মদের টান চারুদের নাড়ীর টান। বিলিতি মদের টান তার চেয়েও বেশি। তবু চারু আড় চোখে বোতলটা দেখে আর অন্যমনস্কভাবে নাকে

আঙুল ঘষে কয়েকবার। কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে মন। ঘেন্না ঘেন্না* ভাব একটা। কোথাকার কতকগুলো এদে-বেদে মিনসে আর মাগী, সার্কাসী ছানা-পোনা—তাদের এঁটো-কাঁটায় ঠোঁট ঠেকাতে ঘিন ঘিন করছে মন।

'চারু-বউয়ের কাছে দিব্যি করে এসেছিস নাকি চারু?' মন্মথ ভুরু কুঁচকে চাইল।

'দিব্যি—? ভাগ্!'

'তবে হাত গুটিয়ে যে?'

'কই না! আজ তেমন মেজাজ পাচ্ছি না।' চারু লীলাবতীর দিকে একচোখ তাকিয়ে নিয়ে মন্মথকে মৃদু স্বরে বললে, 'তোর সঙ্গে দু-চারটে টক্ আছে। একটু বাইরে আয় না?'

'বাইরে? তা চ'—বাইরেই যাই।' মন্মথ উঠে পড়ল।

চারুও উঠে দাঁড়িয়েছে। লীলাবতী হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করল, 'বাড়িতে বাবুর বউ আছে বুঝি?'

মুখে জবাব দিল না চারু, লীলাবতীর হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল। ওর হয়ে জবাবটা দিল মন্মথ-ই। বললে, 'বউ থাকলেও চারুর আমাদের বউ-বাতিক নেই। চাই কি তেমন হ'লে বউ ছেড়েই ও তোমাদের দলে ভিড়ে যেতে পারে।'

মন্মথ চারুর কাঁধ ধরে টাল সামলে হাসতে লাগল। মুখের বাতাসে ওর ঝাঁঝালো গন্ধ মদের।

'ভিড়লেই আমরা ভিড়িয়ে নি, বাবু।' লীলাবতী খিল খিল করে

হেসে পান্টা জবাব কাটল। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল বোতলটা। হাঁ করল চাতক পাখির মতন গলা উঁচিয়ে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে বোতলের মুখ, দাঁতের চাপে কাঁচটা যেন এখুনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।

তলানিটুকু চোঁ-চুমুকে শেষ ক'রে লীলাবতী আয়ারের দিকে তাকাল। আয়ার একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিল। অক্লেশে সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে থাকে লীলাবতী, আর পা দোলায়।

অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চারু মুখ ফিরিয়ে নেয়। পা বাড়ায় বাইরে।

বাইরে এসে এক জায়গায় বসল চারু। মন্মথও বসল পাশে।

'দেখলি ?' মন্মথ গলার সুরে রহস্য ভ'রে শুধোয়।

'দেখলাম। কোথা থেকে ধরে আনলি এদের ?' চারু বিড়ি ধরিয়ে বলে।

'মেলা থেকে। বললাম না যাবার আগে তোদের। অণ্ডালে এক দিদি থাকে আমার, তার কাছেই গিছলাম।'

'তা বলেছিলি বটে। তবে কি না অণ্ডালের মেলা থেকে তুই এক ফ্যাচাং জুটিয়ে আনবি কে জানত ?'

'ফ্যাচাং কি রে চেরো, এ শালা সার্কাস। এ গাঁয়ে সার্কাস এসেছে কোনদিন এর আগে ?' মন্মথ গলা উঁচিয়ে বলে।

'সার্কাস না কচু। দেড় বিঘের ডোবা তাকে বলি পুকুর। সার্কাস শালা দেখিস নি তুই ? গতবার যে আসানসোলের সেই মাঠে শীতকালে

সার্কাস এসেছিল, 'রয়েল সার্কাস', আমরা গেলুম তিনজনে—মনে নেই•
তোর ?'

'থাকবে না কেন ! গিছলাম তো।'

'তবে ? তাকেই বলে সার্কাস। দেখেছিলি প্যাণ্ডেলটা—একটা প্রাসাদ যেন। বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, বাঁদর, কত কী। আর কী সব খেলা—মনে আছে, না নেই ?' চারু যেন মন্মথকে ধমক দেয়, 'ওকেই বলে সার্কাস, বুঝলি শালা ! আর তোর এই তাপ্পিতুপ্পি ইল্‌বিল্ হাঘরেদের ন্যাঙচা খেলাকে সার্কাস বলে না, রাস্তায় রাস্তায় বাঁদর নাচিয়ে, ভাল্লুক নাচিয়ে যেমন মাদাড়িকো খেল্ দেখায় এও তাই। দূর-দূর, সার্কাস বলিস না একে, লোকে থুতু দেবে।' চারু নিজেই খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দেয়।

আহত হয় মন্মথ। আহত হওয়ার মতই ব্যাপারটা।

'সব জিনিসকে তুই বড় তাচ্ছিল্য করিস, চারু।' মন্মথ বলল, 'আমি কি বলছি এ সার্কাস সেই রয়েল সার্কাসের মতন। তবু, ছোট হোক না কেন এও তোর সার্কাস বই কি !'

'হ্যাঁ, যেমন কুচো চিংড়ি আর গলদা চিংড়ি।' চারু ঠাট্টা করে হাসে, বলে, 'যাকগে ও সব ফালতু কথা। কাজের কথায় আয়। কোথা থেকে ধরে আনলি এদের, কেন আনলি ?'

'আমি কি পায়ে ধরে সেধে আনলুম নাকি ?' মন্মথ চটেমটে বলে, 'বললাম তো অণ্ডাল গিয়েছিলুম। পৌষ সংক্রান্তির মেলা বসেছিল ওধারে। মেলায় দেখলুম ওরা খেলা দেখাচ্ছে। তারপর মেলা ভাঙল। আমি যে দিন ফিরছি, স্টেশনে ওই আয়ার আর লীলার সঙ্গে দেখা। মেয়েটাকে

মেলাতেই সাপের খেলা দেখাতে দেখিছি। সে কি খেলা মাইরি, ভাবলে এখনো আমার গা শির শিরোয়। আমার কাছেই এল ওই আয়ার। খোঁজ-খাঁজ নিতে চায়, কোথায় গেলে ছু'পয়সা আসবে। তা দিলুম বলে ছু-দশটা অমন জায়গা। বললাম, বখরা দিতে রাজী থাকো তো আমার গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে বসাতে পারি—কয়লাকুঠীর মধ্যে। নিজের জায়গা দিয়ে দেব, সব ব্যবস্থা করে দেব কিন্তু দশ আনা ছ'আনা বখরা। বেটা যেন হাতে স্বর্গ পেল। তক্ষুনি রাজী।'

'বখরার দশ আনা তোর ?'

'না, ছ'আনা।'

'জমির ভাড়া ?'

'ওরই মধ্যে।'

'বা, বা রে শালা, বিজনেস্-ম্যান আমার! কি-বা বুদ্ধি তোর! বন থেকে টিয়ে ধরে এনে ডিম পাড়াচ্ছিস ? তা তোর ছ'আনার মধ্যে চার আনা তো ওরা বিলিতি মদ মেরে উসুল করে নিলে রে!'

'যা, যা—অত লিতে হয় না, নেহাত আজ পয়লা দিন। এল টেল সব। তাই খাতির। কাল থেকে ওই তাঁবুতে।' মন্মথ কথা শেষ করে আঙুল দিয়ে তাঁবু ছুটো দেখিয়ে দিলে।

একটু চুপচাপ। তারপরই মন্মথ কাজের কথা পাড়ল। অর্থাৎ কাল থেকে সার্কাসের তাঁবু খাটান হবে—বিজলী বাতির তারা জ্বালিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে সার্কাসের তাঁবু।

'তারাপদকে নিবি, তোর মিস্ত্রীটাও তো আছে—নিবি তাকে। কাল

পরশু দুদিনে সেরে দিবি সব, পারবি না?' মন্মথ বলল, 'ভেবে চিন্তে পয়েন্টগুলো দিস, চেরো। গণেশ অপেরার যাত্রার আসর যেমন ঝলমলিয়ে দিয়েছিলি, ঠিক তেমনি। জোর জোর বাতি দিবি রে; লাল নীল বাতি।'

'তার টার আনতে হবে, বাল্‌ব্‌ চাই। এ সবের ব্যবস্থা ক'রেছিস?' চারু জানতে চায়।

'না। এখনো করিনি। সবেই তো ফিরলাম আজ। কালই করব। তার আগে দেবলাকে চাই, বুঝলি চারু। উ শালা যদি সাহেবকে একটিবার বলে মাঙনাতেই জুটে যাবে সব স্টোর থেকে।'

'এত জিনিস মাঙনাতে?' সন্দেহ প্রকাশ করে চারু।

'কত আর? বেশ, না দেবে মাঙনাতে তো নেবে কিছু। তা নিক। সাহেবের পারমিসন্‌টা তো আগে ভাগেই নিতে হয়, কি বল?'

'নিশ্চয়। নয়তো তোমায় তার টানতে দিচ্ছে কে?'

কথা বলতে বলতে ওরা দুই বন্ধুতে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় এক ঝলক তীব্র আলো দূর থেকে তাঁবুর গায়ে এসে পড়ল, শুনতে পাওয়া গেল মৃদু একটা যান্ত্রিক গর্জন। চোখের পলকেই বাতিটা দুফলা হয়ে ওদের গায়ে এসে পড়ে, লম্বাটে ছড়ান আলোর ঢেউ একটু পরে হঠাৎ হ্রস্ব ও ভোঁতা হয়ে যায় নিমেষের জন্যে। তারপর স্থির হয়ে থাকে।

'হাই—', হাঁক দেয় দেবল।

'শালা, এল রে!' মন্মথ এগুতে থাকে। চারুও।

গাড়ির কাছে এসে ওরা দেখে, ডানহাতি দরজাটা খুলে দেবল একটা পা ফুটবোর্ডে ঝুলিয়ে বসে রয়েছে।

'হ'ল কি তোর সারাদিন?' মন্মথ পা-দানিতে পা তুলে দিয়ে বললে, 'ছিলি কোথায় তুই?'

'বরাকর। সাহেবকে নিয়ে গেলাম বেগুনিয়া উড সাহেবের বাড়ি। সেখান থেকে অফিস। কী যে মাইরি জমলো দু' জনে, পাক্কা চার ঘণ্টা। গাড়ির গিয়ারটা স্লিপ মারছিল। গ্যারেজে এসে আবার ঝাড়া দু' ঘণ্টা লড়ে গেলুম। মেরামত ক'রে তবে আসছি। শব্দ মারছিল একটু। সাহেব বলল, ট্রায়াল লাগাও। ট্রায়াল লাগাতে বেরিয়ে পড়েছি। আসবি? চল, তোদের থোড়া হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসি।'

'রাখ্ তোর হাওয়া।' মন্মথ বাধা দেয়, 'নেমে পড়। আয়, সিধে চলে আয়। তাজ্জব ব'নে যাবি!'

'হ্যাঁ, মাইরি দেবলা' বলল চারু, 'বোকা ব'নে যাবি স্রেফ। মন্মথ যে কাণ্ড করেছে! এক সার্কাসের দল এনে বসিয়েছে বাড়িতে। ওই দেখ্ না আধখানা তাঁবু খাড়া।'

'সার্কাস?' দেবল অবাক।

'শুধুই সার্কাস নয়। আর কত কি—' চারুর গলায় তরলতা, 'সে সব দেখলে তোর কলজেতে নেশা ধরে যাবে। মাইরি দেবলা, এক যা ছুঁড়ি আমদানি করেছে না; বেটি যেন এই ভাঙে তো সেই ভাঙে, গা গতরে ঢলছে আর বেবাক মদ মারছে।'

'আর সেই পেখম-তোলা ময়ূর! শালা—বল্ একবার।' মন্মথর গলা ভিজে যায়।

সার্কাসের তাঁবুটা গাড়ির আলোতে চোখে পড়েছিল দেবলের আসার

পথেই। কৌতূহল ওর কম। তবু জানার বাসনা হয়েছিল বৈকি। গাড়ির প্রসঙ্গ শেষ হ'লে হয়তো নিজেই সে কথাটা জানতে চাইত। তার আগেই চারু খবরটা জানিয়ে দিল রসিয়ে।

হাত ধরে মন্মথ আবার টানল। বলল, 'নেমে আয়, চক্ষু সার্থক হয়ে যাবে তোর।'

দেবল নেমে পড়ল। নিভিয়ে দিল গাড়ির হেড-লাইট।

ঘরে পা দিয়ে তিনবন্ধু থমকে দাঁড়াল।

দেখার মতই না দৃশ্যটা! লীলাবতী আয়ারের বুকের এক পাশে মাথা গুঁজে হেলে পড়েছে। একটা হাত তার আয়ারের গলায় জড়ান। ফাঁপা চুলের ওপর আধখানা মুখ ভাসছে। চোখের পাতা জুড়ে এসেছে ওর, ঠোঁট দুটি অল্প একটু চেরা। মাথায় গোঁজা বকের পালকটা খসে পড়ার অবস্থা।

বৃষ্টির জল জমে জমে পুকুর যেমন থৈ থৈ করে, আর টলটলে সেই কানায় কানায় ভরা কালো জল যেমন আপনাতেই আপনি বিভোর, চুপ—ঠিক তেমনি, লীলাবতী থৈ থৈ করছে নেশায়, আর সেই নেশায় ও চুপ।

তিন বন্ধুর চোখে লীলাবতীকে অন্য রকম দেখাল বুঝি। মদ খেলে যে নেশা, মদ গায়ে মাখলে সে নেশা কি হয়? তবু ওদের মনে হ'ল লীলাবতীর যেন সেই নেশাই হয়েছে, গায়ের নেশা। চুল, চোখ, মুখ, গলা, গা—সর্ব অঙ্গে মদ মেখে নেশায় ভিজিয়ে সুতীর পাতলা সেমিজ পরা মেয়েটা আলস্যে এলিয়ে রয়েছে। শ্যামলা-রং ঘাড়ের বাঁক থেকে কণ্ঠা

ছাড়ান সেমিজের খোলা গলা; বুকের একটু নীচু পর্যন্তই দেখা যায়। গঠন ভাল, গড়নে মিশ খায় গলা, বুক আপনাতেই। একটা পা টান টান করে ছড়িয়ে দিয়েছে লীলাবতী। হাঁটুর নীচে-সেমিজের ঝালর। আঁকাবাঁকা, অগোছাল। একদিকের পুরুষ্ঠ পায়ে ঝালর সরে গেছে—হাঁটুর ওপর পর্যন্ত দেখা যায়।

আয়ারের মাথাটাও হেলে পড়েছিল এক পাশে। একটু বেশি নীচু হ'লেই লীলাবতীর মুখে আয়ারের মুখ ঠেকে যাবে। একটা হাতে লীলাবতীর কোমর ধরে আয়ার যেন ঝিমচ্ছিল। চিকন-চাকন মেয়ে কৃষ্ণার চোখ খোলাই ছিল; নজর পড়েনি কারও। সেই কৃষ্ণাই শ্যামসনের পায়ে ঠেলা দিয়ে হেসে উঠল হঠাৎ নরম আমেজী গলায়।

তিনবন্ধু সে হাসিতে সচকিত হ'ল। আয়ারও। মুখ তুলল আয়ার। শ্যামসন আগের মতই নির্বিকার চিত্তে হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকল।

আয়ারের দিকে তাকিয়ে মন্মথ টেনে টেনে একটু হাসল, ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিই বোধ হয়, তারপর বলল, 'বেড়ে আছ! মশগুল!'

আয়ার ঠোঁট ফাঁক করে রসিকতাটুকু উপভোগ করার খুশী জানাল, না কি কিছু বলতেই চেয়েছিল ঠিক বোঝা গেল না। লীলাবতী ততক্ষণে নড়ে উঠেছে।

দেবলের চোখ পড়েছে আয়ারের ওপর এতক্ষণে। মিশমিশে কালো রঙ, ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল। হাড়-কঠিন রুক্ষ মুখ। বাঁ গালে বিশ্রী রকম কতকগুলো ক্ষতের দাগ। ঠোঁট দুটো অসম্ভব পুরু আর ঝোলা।

ক্ষুদে ক্ষুদে দুটি চোখ। চ্যাপ্টা নাক। লাল সাদায় গোল গোল ডোরা কাটা গেঞ্জির তলায় একটা পেশীবহুল বুক আছে এ কথাটা যেন প্রমাণ করার জন্তেই আয়ার হাতে হাত মিলিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো, উঁচু করল সে হাত মাথার ওপর। সেই ফাঁকে বাঘের খেলা দেখান হাত দুটোর দম্ভও যেন প্রকাশিত হ'ল।

দেবলের চোখ দুটোও স্থির, ছোট হয়ে এল। বাহুমূলে একটা পেশী কাঁপল হঠাৎ কয়েকবার। দাঁতে তার দাঁত ঘষে গেল। হাতটা তার কি যেন খুঁজছে। সেই পিকিনিজ ডগ্—জলি। জলি কাছে নেই। কাছে থাকলে দেবল তার মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিত। ধারাল দাঁতে কামড় বসাত জলি।

লীলাবতী ততক্ষণে হেলে দুলে উঠে বসেছে।

ঠেলা দিয়ে মন্মথ বন্ধুদের বললে, 'চ' একটু বুড়ি ছুঁইয়ে বসি।'

দেবল নড়ল না। দাঁড়িয়ে থাকল। চুপ করেই। দৃষ্টিটা শুধু আয়ারের ওপর থেকে তুলে নিয়ে লীলাবতীর মুখে রাখল।

চারু আর মন্মথ এগিয়ে বসল তক্তাপোশের ওপর।

'চিনিয়ে দি ওকে।' মন্মথ লীলাবতীকে লক্ষ্য করে দেবলকে পরিচিত করাতে ব্যস্ত হ'ল, 'এই আমাদের আর এক বন্ধু—। দেবল। দেখতে মানুষ; আসলে ও একটা লোহার পিলার। সাহেবের খাস লোক। ফুল স্পীডে গাড়ি চালায়। দুটো পাগলা মোষকে দু'হাতে রুখতে পারে।'

লীলাবতীও দেখছিল দেবলকে। ছ'ফুট লম্বা, শাল তরুর মত সে দেহ। ছে'চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি টান করে দাঁড়িয়ে। মাথার ঝুঁটি

আর মুখের দাড়ির মধ্যে দেবলের লম্বাটে মুখখানা খোদাই করা পাথরের মতন দেখায়। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে দেবল তারই দিকে। সে দৃষ্টিতে মুগ্ধ বিহ্বলতা নেই, ঠিক যে বিস্ময় আছে তাও নয়। কেমন একটা উগ্র উজ্জ্বল দৃষ্টি। তবে লীলাবতীর কালো টান-টান দুই ভুরুর নীচে, সুর্মা টানা কাঁচ-ঝিকমিক আধবোজা চোখের দৃষ্টিতে একটা আকর্ষণ—আছে বৈকি! দেবল তা অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই তার দৃষ্টিতে একটু আবেশের ভাবও ফুটে থাকে।

আয়ার দেবলের দৃষ্টিতে কি দেখল কে জানে, অযথাই হাত বাড়িয়ে লীলাবতীর গলা জড়িয়ে ধরল অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে। হেলে পড়ে আবার গায়ে গা ঘেঁষিয়ে দিল লীলাবতীর—আর কেমন বিকৃত একটা হাসিতে চোখ মুখ কুঁচকে অবহেলা সূচক চোখে তাকিয়ে থাকল দেবলের দিকে। বাঘ বশ করা দাম্ভিক একটা স্বাতন্ত্র্যই ফুটে উঠল তাতে, লীলাবতী সম্পর্কে। তার অধিকারটুকুও বোধ হয়।

সকলেই চুপ। ঘরের তরল আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন ভারী হয়ে উঠেছে। মন্মথ একবার দেবল, একবার আয়ার-লীলাবতীর দিকে তাকায়; মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চারু; কৃষ্ণাও ঠোঁট ফাঁক করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

'কি রে?' মন্মথই অবশেষে ঠেলা দিল, 'হ'ল কি তোর?'

কি যে হয়েছে দেবলের নিজেই সে কি জানে? অথচ ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে তার জলিকে কাছে পেতে, তার সরু সরু দাঁতের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে কামড় খেতে। নিশপিশ করছে দেবলের দুটো হাতই। শিরশির করছে লোমগুলো গায়ের।

লীলাবতী হঠাৎ মুচকি হেসে ডাকল হাত দিয়ে—একটা জায়গা দেখিয়ে দিলে, বসতে। আয়ার হাত বাড়িয়ে মদের বোতলটাই কাছে টানতে যাচ্ছিল, লীলাবতী বাধা দিল। ইঙ্গিতে দেবল-চারুদের দেখিয়ে মৃদুস্বরে কি বলল যেন। অর্থাৎ বোঝা গেল, ওটা দেবলের জন্যেই অবশিষ্ট—রাখতে বলছে লীলাবতী।

দেবলের হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল—দু'পা এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে বোতলটা খপ করে তুলে নিল। তারপর সকলকে অধিকতর বিস্মিত করে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বোতলটা উপুড়-মুখো করলে, মাটিতে ছড়িয়ে দিলে উগ্র-গন্ধ পানীয়টুকু। আয়ার আর লীলাবতীর দিকে তাকাল স্থিরদৃষ্টিতে অল্প ক'টি মুহূর্ত। ছুঁড়ে দিলে বোতলটা এক কোণে। কোন কথা বলল না, মুখের কোথাও একটু রেখার পরিবর্তন হ'ল না। যেমন এসেছিল হঠাৎ, তেমনি হঠাৎই ঘর ছেড়ে চলে গেল। যেন একটা বুনো মোষ অতর্কিতে দেখা দিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে, আবার অতর্কিতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। সমস্ত ঘর আরো চুপ; আরো অবাক।

*

* *

ভাটিখানার মাঠে দেখতে দেখতে সার্কাস জমে উঠল। পাথরচটি, মধুবন আর রাধানাথপুরের লোকের কাছে এই সার্কাসই যথেষ্ট। শহরে গিয়ে আর ক'টা লোকই বা বাঘভাল্লুকের জমজমাট সার্কাসের খেলা দেখেছে?

বিশেষ করে মেয়েদের কাছে, আঘোরী, বাউরী, ক্যাওট, সাঁওতালদের কাছে 'গ্রেট লিল্‌লা সার্কাস'ই এক বিরাট বিস্ময়।

সকাল থেকেই ভাটিখানার মাঠে ছাড়া ছাড়া হয়ে ভিড় জমে; নানান মুখে নানা কথা—। অবশ্য সার্কাসের দেখা খেলা অথবা শোনা খেলা নিয়েই যত বাক্‌বিস্তার আর বচসা।

কোলিয়ারীর কারখানায়, খাদে, পাওয়ার হাউসে—সর্বত্রই বাঘ আর সাপের গল্প, আয়ার আর লীলাবতীর কেরামতির কথা। তারই প্রসঙ্গে কে কতবার সার্কাস দেখেছে, বাঘ দেখেছে, তার কথা এসে পড়ে; এসে পড়ে সাপ কামড়ানর গল্প থেকে মন্ত্রপ্রাপ্ত ওষুধ-ওষুধির চমৎকারিত্বের নানান আখ্যান-ব্যাখ্যান।

এক কথায়, 'গ্রেট লিল্‌লা সার্কাস' পাথরচটি কোলিয়ারীজ লিমিটেডের কয়লা-অন্ধ জীবনে যেন এক নতুন সুর আনল—নতুন নেশা, নতুন উত্তেজনা।

এই সুর, নেশা আর উত্তেজনায় সবচেয়ে বেশি যদি কেউ অধীর-আকুল হয়ে থাকে তবে সে চারু। আশ্চর্য এই চারু। প্রথম দিন মন্মথর কাছে এসে লিল্‌লা সার্কাসের দলবলকে সে পাত্তা দিতে চায় নি, উপেক্ষা অবহেলা করেছে, ঠাট্টা করেছে মন্মথকেই কতবার। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সার্কাসের তাঁবুতে তার টেনে, বিজলী বাতি লাগাতে লাগাতে চারু যেন কোথা থেকে কোথায় চলে গেল। এক দেশ থেকে আর এক দেশেই বোধ হয়। কিম্বা হয়তো বলা ভাল, কয়লা-কুঠীতে যে মন আর বশ মানছিল না সেই মনটাই অন্য কোথাও পালিয়ে গেল।

চারু আর বাড়ি ফেরে না। ফিরলেও কখন আসে বকুল সব সময় বুঝতে পারে না। চুপিসাড়ে এল চারু, হয়তো তখনও সর্বাঙ্গে তার ক্লান্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ, গা মুখে মদের গন্ধ ভর ভর করছে, চোখ লাল, পানের ছোপে দাঁত লাল, মুখ চোখ শুখনো, কালো, চুল রুক্ষ, কাপড় জামায় যত রাজ্যের নোঙরা। চারু এল, দু-চারটি কথা বলল কি বলল না, জামা কাপড় ছেড়ে খাকি প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট পরে কাজে বেরিয়ে গেল।

চা জলখাবার নিয়ে বকুল সাধাসাধি করলে চারু একটু কিছু মুখে দিয়ে চায়ের গ্লাসটা তুলে নেয়।

'কাল রাত্তিরে এলে না কেন? আমি মাঝরাত পর্যন্ত খাবার আগলে ঠায় জেগে থাকলুম?' বকুল প্রশ্ন করে।

'থাকলে কেন? আমি তো বলেছি, ক'দিন এখন আমার ফেরার ঠিকঠাক নেই।'

'কি এত কাজ তোমার ওখানে গো?' বকুল অভিমানে বলে, 'বাড়িতে তোমার বউ সকাল বিকেল খাবারের পাত আগলে না খেয়ে দেয়ে হাঁ ক'রে পথ চেয়ে থাকবে আর তুমি দিব্যি নেশাভাঙ করে সর্বক্ষণ পড়ে থাকবে ওখানে? কি আছে সেখানে? আমার ভয়-ভাবনা হয় না?'

'বাজে কথা কও কেন? কোন্ হাজার মাইল দূরে রয়েছি যে ভয়-ভাবনা হবে?' চারু উঠতে উঠতে বলে, 'ওখানে আমার অনেক কাজ। বন্ধু লোক মন্মথ। সার্কাস এনে বসিয়ে ফেলেছে যখন, তখন তাকে কাজে-কর্মে সাহায্য করতে হবে বৈকি। বউ আগলে বসে থাকলেই পুরুষ মানুষের দিন চলে না।'

অভিমানী বকুলের কানে কথাটা আরও তীব্র হয়ে লাগে। আস্তে আস্তে' বকুল বলে, 'কোন্ দিনই বা আমায় তুমি আগলে বসে থেকেছ? দায়ে পড়ে বিয়ে করেছ বলেই না আমি তোমার বউ, নয়ত কোথাকার কে!' কথার শেষে বকুলের গলা ভারী হয়ে জল এসে পড়েছিল চোখে।

চারুও যেন বলতে যাচ্ছিল, কথাটা ঠিকই, দায়ে পড়ে বিয়ে করেছে ব'লেই বকুল তার বউ; নয়তো—! কিন্তু বকুলের দিকে তাকিয়ে কথাটা গলায় আটকে গেল চারুর। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবল যেন, তারপর হেসে বললে, 'কেন কাজে যাওয়ার সময় মিছিমিছি কান্নাকাটি করছ। দায়টায়ের কথা কি আমি বলেছি তোমায়? নাও, যাও এখন কাজে যাও। আমি বারোটার মধ্যেই খাদ থেকে ফিরব আজ।'

সেদিন দুপুরে চারু সত্যিই বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। ফাঁকা উঠানে রোদে বসে থাকে। কাশি হয়েছে বড়। বকুল স্বামীর বুকে-পিঠে সরষের তেল মাখিয়ে দেয় অনেকক্ষণ ধরে। জল গরম করে মিশিয়ে দেয় বালতিতে। বলে, 'বেশি জল ঘেঁটনা।'

স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে চারু।

খানিক পরে বকুল আসে। বলে, 'আজ দুপুরে কাজে যাবে না?'

'না। ছুটি মেরে দিয়েছি। আর একটা পান দাও তো।'

বকুল পান দেয়।

'খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, পাট চুকিয়ে ফেলেছি।' বকুল চারুর পাশে বসে।

চারু হাত বাড়িয়ে বকুলকে লেপের মধ্যে টেনে নেয়।

'নাও, একটু ঘুমিয়ে নাও। সার্কাস দেখতে যাবে আজ? মন্মথ কবে থেকেই তোমায় নিয়ে যেতে বলছে।'

অনেক দিন পরে মধুর একটা আবহাওয়া ঘনিয়ে আসছিল। সার্কাসের প্রসঙ্গে হঠাৎ যেন সব ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়। চারুর ঘন সান্নিধ্যের মধ্যে, লেপের উত্তাপের তলায় থেকেও বকুলের মনে হয় সমস্ত রেশটুকু কেটে গেল—মিলিয়ে গেল এক সর্বনেশে দমকা হাওয়ায়।

'না।' বালিশে মুখ গুঁজে বকুল দীর্ঘনিশ্বাস চাপে।

চারু শীতের দুপুরে অসাড়-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে বিকেলে। মুখ হাত ধুয়ে, চা খেয়ে, সেজে গুজে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে চারু। বড় দেরি হয়ে গেছে, সার্কাস বুঝি আরম্ভ হ'ল ব'লে। লীলাবতী নিশ্চয়ই সেজে গুজে তৈরি হয়ে বসে আছে তার সাপের খেলা দেখানোর অপেক্ষায়।

'তাড়াতাড়ি ফিরবে তো?' যাবার পথে বকুল প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ ফিরব।' চারু কোনো রকমে জবাব দিয়ে দরজা পেরিয়ে পথে নেমে যায়।

বকুল জেগে থাকে। শীতের সন্ধ্যে গাঢ় হয়, রাত আসে। গভীর হয় রাত; তারপর মাঝরাত। তবু চারু আসে না। বকুল চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকে। কান খাড়া থাকে, কখন চারুর হাতে সদরের কড়াটা নড়ে উঠবে। শরীরটা খারাপ বকুলের। আর যেন দেহ বয় না। ভীষণ আলস্য লাগে। কি যেন হয়েছে তার! বড় ঘুম পায় সারা দিন। মনটা আনমনা হয়ে থাকে। কি ভাবে বকুল! ভবিষ্যতের জন্যে

একটা ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন যেন জমা হচ্ছে, সেইটাই অবসরে একা একা বুঝি দেখে বকুল। তাতেই যা সুখ, আনন্দ। চারুর মনকে সে তো আর টানতে পারে না; পারল না। পছন্দ করে বিয়ে করা বউ হ'লে বোধ হয় এমন করত না চারু তার সঙ্গে। সবই বকুলের ভাগ্য!

বসে থাকতে থাকতে বকুল এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে: খাদের মুখে কতকগুলো হরিণ এসেছে, তার মধ্যে একটা হরিণের মুখ ঠিক চারুর মতন। বড় ভয় করে বকুলের। ওই চঞ্চল হরিণ কখন যে খাদের অতল গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়বে কে জানে!

ভয়ে সারা গায়ে ঘাম দিয়ে স্বপ্ন যখন ভেঙে যায় তখন আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। খাটটা তেমনি শূন্য পড়ে আছে—চারু ফেরেনি। বকুল খালি বিছানাটায় হাত বুলতে বুলতে কচি মেয়ের মত গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে।

বকুলের চোখের জলের হিসেব রাখার সময় নেই চারুর। সে ইচ্ছেও তার আছে, এমন মনে হয় না। পাথরচটির রঙটাই কেমন যেন বদলে গেছে চারুর চোখে। খাদের অন্ধকার, কয়লার কটু ধোঁয়ায় ভরা মধুবনের বাতাস, প্লাস, রেঞ্চ, হাতুড়ি—সমস্ত তালগোল পাকিয়ে বিবর্ণ একটা স্বপ্নের মতই মনের কোণে পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ উঁকি দিয়ে যায়, এই যা। চোখের ওপর কিন্তু সর্বক্ষণ ভাসছে এই সার্কাসই, যে সার্কাসকে একদিন নিতান্ত অবহেলায় ও অস্বীকার করেছে। অথচ আশ্চর্য, আজ

আর সেই সার্কাসকে সে অমন ভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে না। লিল্‌লা সার্কাসের চুনোপুটি খেলা আর খেলোয়াড়দের দেখে চারু মোহিত হয়ে গেছে এমনও নয়। বরং কলকাতিয়া চারুর কাছে আজও আয়ার, শ্যামসন, কৃষ্ণা—এরা করুণার পাত্র। তেমন কোনো আগ্রহই নেই চারুর এদের জন্যে। যত আগ্রহ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে এক কেবল লীলাবতীতে। লীলাবতীর জন্যেই লিল্‌লা সার্কাসের ওপর যত টান চারুর। লীলাবতীকে বাদ দিয়ে যেমন লিল্‌লা সার্কাস নয়, তেমনি সার্কাস বাদ দিলে লীলাবতীও আর থাকে না। শ্যামলা-রঙ চটুল মেয়েটার মুখের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে তাকিয়ে চারু যেন তাই ভাবে।

সাপের খেলা দেখাতে লীলাবতী সেজেগুজে বসে আছে। কালো আঁকা-বাঁকা ডোরা টানা টানা এক অদ্ভুত জামা গায়ে দিয়েছে লীলাবতী। অর্ধেক বুক খোলা, হাঁটুতকও ঝুল নামেনি সে জামার। মাথার চুল আঁট-সাঁট করে ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। চোখে সুর্মা, গালে ঠোঁটে রঙ। এততেও হয় নি তার—একটা মাদকতা মেখে নিচ্ছে গায়ে, মনে, চোখে—আস্তে আস্তে। যেন নেশা দিয়ে সাপকেও বশীভূত করতে চায় লীলাবতী।

'দেখছ কি চারুবাবু ?' লীলাবতী চোখ টেনে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে।

'সাপ।' চারুও হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'বোঝা মুস্কিল, আসল সাপটা কে—তুমি, না, ওই চার হাতি কালো খাঁচায় পোরা জীবটা ?' একটু থেমে চারু আবার বলে, 'কত দিন এই সাপের খেলা দেখাচ্ছ তুমি ?'

'তিন বছর।'

'ইস!' জিভের একটা শব্দ করে চারু, 'ওই ঠাণ্ডা, ঘিনঘিনে সাজ্যাতিক জীবটা তোমার পা থেকে গলা পর্যন্ত পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে, ঘেন্না হয় না তোমার, ভয় না হয় নাই করল?'

লীলাবতী মাথা নাড়ে। তেমনি ভাবেই ব'সে হেসে বলে, 'ঘেন্না হবে কেন? তোমার বউকে তুমি ঘেন্না কর, চারুবাবু? ও সাপও আমার তেমনি। ঘর করছি তিন-চার বছর।'

একটু বোধ হয় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে চারু। বুকের মধ্যেও কে যেন ঠক্ করে একটা হাতুড়ি পিটে দেয়। কথাটা পাল্টে নেয় চট্ করে।

'ছেলেবেলা থেকেই তুমি সার্কাসের দলে আছ, না?'

লীলাবতী হাত দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়, একেবারে মায়ের পেটে যখন তখন থেকে সে সার্কাসের দলে।

লীলাবতীর জীবন-কাহিনীটা গল্পে গল্পে শুনে নেয় চারু। সে আরও অদ্ভুত কাহিনী। লীলার বাবা প্রথমে পল্টনে চাকরি করত। কিসের একটা গাফিলতিতে তার চাকরি যায়। ভদ্রলোকের ভীষণ ঝোঁক ছিল সার্কাসের ওপর; সার্কাসের দলে ভিড়ে গেল। সার্কাসে লীলার বাবা প্রথমে ঘোড়ার খেলা দেখাত। সেই খেলায় তার নাম হ'ল খুব। এ দল থেকে ও দলে, আবার সে দল থেকে অন্য আর এক দলে; এমনি করে করে বছর পাঁচ-ছয় কেটে গেল—ঘোড়ার খেলা থেকে বাঘ-সিংহের খেলা দেখাবার যোগ্যতা অর্জন করে নিল তার বাবা। দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান

সার্কাসে থাকার সময় ওর বাবা এবং আরও দু-একজন বাঙালী খেলোয়াড় মিলে এক নতুন দল খুললে, নাম যার আজও অনেক লোক জানে—সেই বেঙ্গল সার্কাস। ওর বাবার ভীষণ বাঙালী বাতিক ছিল। বাঙালীদের স্বাস্থ্য, সাহস, ধৈর্য আর বুদ্ধি যে কারও চেয়ে কম নয়, যেন সেটা প্রমাণ করতেই বেঙ্গল সার্কাস খুলে ফেলল ভদ্রলোক। বিয়ে করল এক আধা-বাঙালী মেয়েকে—সার্কাসেই যে মেয়ে আগুন আর ছোরার নাচের খেলা দেখাত। খুব চলেছিল ক'বছর বেঙ্গল সার্কাস। তারপর একটার পর একটা অঘটন ঘটতে লাগল। বাবার অংশীদার-বন্ধুর মোটর-বাইকের খেলা দেখাতে দেখাতে বুকের শিরা ছিঁড়ে গেল, মারা গেল লীলাবতীর মা, অন্য অংশীদার সার্কাস ছেড়ে কার্নিভালের ব্যবসায়ে চলে গেল, পা ভাঙল ওর বাবার। দেখতে দেখতে বেঙ্গল সার্কাস তছনছ হয়ে গেল, বহু বাঙালী ছেলেমেয়ে ছিল দলে, তারা ছিটকে-ছাটকে এদিক-ওদিক চলে যেতে লাগল। অভাবে-অনটনে বেঙ্গল সার্কাসের জিনিসপত্র নীলাম হ'ল, কত পশু বিক্রি হয়ে গেল, সাজপোশাক, মায় তাঁবুটাঁবুগুলো পর্যন্ত। লীলাকে তার বাবা-মা হাতে করে শরীর গড়তে, আর খেলা দেখাতে শিখিয়েছে। বাবা মারা যাবার পর ভাগবাঁটরা ক'রে যেটুকু অবশিষ্ট থাকল, লীলাবতী তাই দিয়ে তার দল খুলেছে 'লীলা সার্কাস'। লীলা সার্কাসই কায়দা করে দাঁড়িয়েছে 'লিল্‌লা সার্কাসে'।

'তাও কি সব আছে, চারুবাবু? একটা সিংহ ছিল আমার, সেটা বেচে দিয়েছি। বাঘটা রাখতে হয়েছে সার্কাসে; বাঘ-সিংহই তো আসল। আমার আর কতটুকু জানে বাঘের খেলা দেখানোর, তবু চালিয়ে যাচ্ছে

কোনরকমে। ও আমার অংশীদার, বাবু। লায়ন সার্কাস ভেঙে যাবার পর আমার বাবার সার্কাসে এসে ঢোকে। আমাদের সার্কাসেরও তখন পড়তি অবস্থা। ঘোড়ার খেলা দেখাত তখন আয়ার। তারপর একটু-আধটু যা বাঘের খেলা শিখেছে। একটা ভাল ঘোড়া পোষার অনেক খরচ। তা ছাড়া সার্কাসে ঘোড়ার চেয়ে বাঘের কদর বেশি। ঘোড়াগুলো তাই বিক্রি করে দিলাম।'

লীলাবতী আরও বললে, 'আয়ারের কথাতেই আমি "লিল্‌লা সার্কাস" খুলেছিলাম, চারুবাবু। কিছু টাকা দিয়েছিল ও। অত টাকা ও কোথা থেকে পেল কে জানে! আয়ার না থাকলে সার্কাস আমি রাখতে পারতাম না। ঝামেলা কি কম সার্কাস রাখার? পনেরো জন লোক পোষা—তাদের খোরাকি, মাইনে, বহুৎ ঝামেলা। তার ওপর মেলায় মেলায়, মফস্বল শহরে ঘোরা—জায়গা বুঝে তাঁবু ফেলা—এ কি কম হয়রানির কাজ। আমি মেয়েমানুষ, খেলা দেখাতে পারি, এত ঝামেলা সামলানো মুশ্‌কিল। আয়ারই সব করে। লোকটা খুব কাজের। তবে ভীষণ বদরাগী। জানো চারুবাবু, ও আমায় বিয়ে করতে চায়।' লীলাবতী হাসে।

চারু হাসির মর্ম না বুঝে বলে, 'তা বিয়ে করলেই পার।'

লীলাবতী জবাব দেয়, 'পাগল নাকি!'

রোজগারপাতির কথায় লীলাবতী বলল, 'শহর-টহরে বসতে লজ্জা হয়, চারুবাবু। শহরের লোক বড় বড় সার্কাস তো হামেশাই দেখছে। পয়সা খরচা করে কে আসবে ছেঁড়া তাঁবু আর শুকনো বাঘের খেলা দেখতে।

•তাই আমরা মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াই। ছোটখাট মফস্বল জায়গায় গিয়ে বসি। কোনরকমে চলে যাচ্ছে। রোজের রোজ খাওয়া।'

শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় লীলাবতী তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছেটাও জানিয়ে দেয়। বলে, 'এ হয়রানি আর ভাল লাগে না, চারুবাবু। এ সব ছোট খাটো সার্কাসে পয়সাও নেই, ইজ্জতও নেই। টাকা কিছু-হাতে এলে আমি একটা ছোট কার্নিভাল খুলব। কার্নিভালে বহুৎ আরাম, পয়সাও আছে—জুয়ার টাকায় আমিরী হয়ে যায় ওরা।'

লীলাবতীর কথা শোনে, আর কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠে চারু। আশ্চর্য একটা জীবনের ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো-টাকরা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড়ই অদ্ভুত, কৌতূহলময় জীবন এদের। ঘর-বাড়ি নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, আশা-ভরসা, মায়া-মমতা, ভবিষ্যৎ—তাও নয়। আজ আছে, আজ খেলছে—খেলা দেখাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, হাসছে ; কালকের কথা ওরা জানে না। না জানারই কথা। ঘরমুখো জীবন তো নয়, কেউ নেই পিছু টানার—কার জন্যেই বা ভাববে। জীবনের ধরাবাঁধা সমস্ত নিয়মকেই তারা কত সহজে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। দেহ আর মন কোনোটাই কোথাও আটকে নেই পুকুর হয়ে। সঙ্কোচ, লজ্জার কথাই নেই। মনের স্বাধীনতায় কেউ হাত দেবার নেই ওদের।

চারুর শুধু অদ্ভুতই লাগে না, ভাল লাগে। আসলে চারুও সেই ধাঁচের লোক, যাদের মনটা স্রোতের মত। কোনো এক জায়গাতেই বরাবর টিঁকতে চায় না। ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে পারলেই তাদের আনন্দ, মাঠে ভিড়ে থাকতে অসহ ক্লেশ।

কেনই বা না হবে? চারুর চরিত্রে কোথাও একটা কেন্দ্রবিন্দু নেই, যা তাকে এক নির্দিষ্ট কক্ষপথে ধরে রাখতে পারে, টেনে রাখতে পারে বরাবর। ছেলেবেলা থেকেই আগাছার মতন বেড়ে-উঠেছে। মা ছিল না; বাবারও কোনো দৃষ্টি ছিল না ছেলের ওপর। ফলে, গৃহের প্রতি, সংসারের প্রতি বিশেষ কোনো আকর্ষণ জন্মানোর সুযোগই ঘটে নি চারুর। খেয়েছে-দেয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিয়েছে। জীবন সম্বন্ধে ধারণাটাই তার অন্যরকম। কোনো কর্তব্য, দায়, দায়িত্বর মধ্যে সে চিরকালের জন্যে আটকে থাকতে নারাজ। বাধ্যতায় তার মন বিদ্রোহ করে বসে।

চারু কোনদিন হয়তো এসব কথা তেমন করে ভাবে নি; কিন্তু যতটুকু ভেবেছে, তা থেকে এটুকু বুঝেছে, ওর মন এই কয়লাকুঠিতে চিরকাল আটকা থাকতে পারে না। আর, বকুল সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বকুলের কাছে তার কোনো আশা নেই। চাওয়া নেই। ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে কাছে, আছে একসঙ্গে, থাকছে, খাচ্ছে। কিন্তু তীব্র কোনো আকর্ষণ নেই তার ওপর, শুধু মায়া ছাড়া। বকুলকে চারুর মায়া হয়, মন ছট্‌ফট্‌ করে না তার জন্যে। আর মন ছট্‌ফট্‌ই যদি করা বলো, তবে সে করে বইকি! ভীষণভাবে করে চারুর। কার জন্যে, তা অবশ্য সে জানে না। বিরাট একটা না-জানা অভাব বুকের কোথায় যেন তলিয়ে রয়েছে। সে ফাঁক আগে অতটা ঠাওর হ'ত না। আজকাল হচ্ছে। প্রায়ই কেমন একটা শূন্যতা এসে সব ঢেকে দেয়। ছট্‌ফট্‌ করে মন। মনে হয়—কে যেন নেই, কি যেন সে পাচ্ছে না। নিঃসঙ্গ সে অন্তর-বেদনা বোবা শিশুর মতন করুণভাবে চেয়ে থাকে। বলে না, কি তার চাই, কেন সে এখানে।

লীলাবতী কি সেই অভাব মেটাবে চারুর ? চারু তা ভেবে দেখে নি ; দেখার কথাও নয়। তবে মনের ফাটলটা যেন লীলাবতীর কাছে বসলে অনেকটা ভরাট হয়ে আসে।

মন্মথ হেসে বলে, 'সামলে চারু—অত এগুস নে, শালা। ছোবল দিবে সাপের।'

'দেবে, দিক্। কিন্তু আমার কথা থাক। তোর ব্যাপারটা কি তাই বল ? ময়ূরের পেথম দেখে তুই যে বেহুঁশ হয়ে পড়লি রে ?'

পাল্টা রসিকতাটা উপভোগ করে মন্মথ, ফোলা ফোলা গালে আরও হাসি খেলিয়ে বলে, 'কৃষ্ণা ? তা ঠিক বলেছিস। বেহুঁশই করল বটে। মাইরি চারু, যতই দেখি কেন রে, ততই বুকটা আঁকুপাঁকু করে। যাই বলিস, মেয়েটা ভাল। ছিরিটা নরম-সরম, নাচটাও মন্দ নয়। আর হাসিটা তো ভাই সেরেফ নূপুরের ঠুনঠুন।' চারুর গলা জড়িয়ে মন্মথ ককিয়ে ককিয়ে হাসতে থাকে।

খানিক পরে মন্মথ অন্য কথা তোলে। বলে, 'দু-দশ টাকাও দেয় না যে রে, চারু। টিকিট ঘরে কাউকে বসিয়ে দিই, না কি রে ?'

'দে।'

'তাই ভাবছি। লোক তো মেলাই হয়। বখরামত পাওনা পেলে আমার দশ-বিশটা টাকাও আসে।'

'তা আসে বই কি !'

'তবে দেয় না কেন ?'

'চেয়েছিস তুই ?'

'না। লজ্জা করে।'

'লজ্জা কিসের, হাওলাত নিচ্ছিস তুই—? পাওনা বখরা নিবি।'

মন্মথ অবশ্য অনেকবারই ভেবেছে, টাকাটা সে চাইবে। সার্কাস দলের সঙ্গে সম্পর্কটা তার ব্যবসার, ভাগ-বাঁটরার। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক তো নয় যে, চক্ষুলজ্জা হবে। তবু কেন যেন মুখ ফুটে আর চাইতে পারে নি। বরং টাকার কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে হাসিমস্করা করেছে, ফষ্টিনষ্টি কতই না।

কৃষ্ণাকে মন্মথর খুব ভাল লেগেছে। মেয়েটার বয়স কম। ছিমছাম চেহারা, মুখটা দেখলে মায়া হয়। চোখ দুটো সব সময় ছলছল করছে। কথা বলে সরু গলায়, কম কথা। হাসে খালি খিলখিল করে। মদটদ খায় না। স্যামসন বেটার কৃষ্ণার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম। ওই লোকটাকে দু' চোখে দেখতে পারে না মন্মথ। শয়তান-শয়তান মনে হয়।

কৃষ্ণা ভাল বাঙলা বলতে পারে না। ভাঙা ভাঙা হিন্দী-মেশানো বাঙলা বলে। মন্মথর তাই শুনতে ভাল লাগে খুব। কৃষ্ণাকে দিয়ে কথা বলানোর অছিলা খুঁজে বেড়ায় মন্মথ।

'তারের নাচ তো অনেক দেখালে, কৃষ্ণাবাঈ। এবার মাইরি, একটু পেলেন্ নাচ দেখাও, ডুগি তবলায় তোমার নাচে ঠেকা দেব।'

'বাঈ না বাবুজী।' কৃষ্ণা হাত নেড়ে নেড়ে জবাব দেয়, 'মাট্টিতে নাচ আমি করি না। মগর তুমি যদি দেখতে চাও—দেখাবো।'—কৃষ্ণা খিল-খিল করে হেসে বুড়ো আঙুলে টাকা বাজানোর ইঙ্গিত জানায়, 'নাচ দেখলে টাকা লাগবে।'

'আলবাৎ। কত টাকা নেবে? পাঁচ, দশ—?'

'না, না।' কৃষ্ণা মাথা নাড়ে।

'তবে?'

'যেতনা আছে তোমার, বিলকুল সব!'

মন্মথ তার বুকে হাত দেখিয়ে টিপ্পনী কাটে, 'মায় আমাকে পর্যন্ত নেবে তো?'

তার বেলায় কৃষ্ণা মাথা নাড়ে; না—না। আর উচ্ছল হাসি হাসে।

মনে মনে মন্মথ ভাবে, সত্যি ইচ্ছে করলে সে কৃষ্ণাকে টাকা দিয়ে কিনে রাখতে পারে। বে-জাত, বে-ধম্মকে তো আর বিয়ে করা যায় না। নয়তো বিয়ে করেই ফেলত। অবশ্য একত্রিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত তার বিয়ে করা নিষেধ। বাপের নিষেধ। বাবার গণৎকার কুষ্ঠি বিচার করে নিষেধ করে দিয়েছে। সাজ্ঘাতিক ফাঁড়া আছে মন্মথর, বিয়ে করলে জীবনসংশয়। শুধু সেই কারণেই বিয়ে হয় নি মন্মথর, ঘর-সংসার পাতে নি সে। নয়তো তাদের সমাজে কোন্ গোঁফ-উঠতি বয়সেই তো বিয়ে-থা, বাচ্চা-কাচ্চা হয়ে যায় ছেলেদের।···হিসেব করে দেখেছে মন্মথ, এখনো পুরো চারটি বছর, তারপর ওর বিয়ের সময় আসবে। বাস্তবিক, একটা বউ-টউ না থাকলে ভালই লাগে না। বেড়ে আছে চারুটা। চারু-বউ— বেশ বউ।

কৃষ্ণার আমেজ কিন্তু মুছতে পারে না মন্মথ। ঘুরে-ফিরে কাছে যায়। তারের নাচের খেলা সুরু হ'লে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে। কৃষ্ণাকে একা পেলে বলে, 'বাহাদুর মেয়ে মাইরি, তুমি।'

'কাহে ?'

'বেড়ে নাচো। ধন্যি চরণ দুটি তোমার। ছাতা হাতে কি মানায়—! আহা, ময়ূরের পেখম যেন !'

অতশত রসিকতা পুরোপুরি হয়তো বোঝে না কৃষ্ণা। তবে এটুকু বোঝে, এই বাবুটি তার প্রতি বড়ই অনুরক্ত। অনুরাগীকে কৃপা করতে কৃষ্ণার কৃপণতা নেই।

'তোমাকে দোস্‌রা এক নাচ দেখাব, বাবুজী, একলা।' কৃষ্ণা ঠোঁট টিপে হাসে।

'সত্যি, কবে ? আজ—?'

'না, না। আজ না ; আজ্ না। দোস্‌রা একদিন।'

আলগাভাবে মন্মথর গায়ে ছোঁয়া দিয়ে কৃষ্ণা হাসতে হাসতে সরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। খপ করে হাত ধরে ফেলে মন্মথ।

ঘাড় ফিরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ভর্ৎসনার অপরূপ ভঙ্গিমা করে কৃষ্ণা। হাত ছাড়িয়ে নিতে চায়।

'ছোড় দেও, বাবুজী। আগর কোই দেখবে তো মালুম করবে তোমরা সাথ আমি পেয়ার করছি।'

'কে মনে করবে ? শ্যামসন ?'

'হাঁ।' কৃষ্ণা হাসিমুখে মাথা নাড়ে।

'ও কে তোমার ?'

'কোই না।'

'তবে ?'

'তব্ ভি মনে করবে।' হাত ছাড়িয়ে নেয় কৃষ্ণা। মুখের হাসিটাও কেমন ম্লান হয়ে আসে হঠাৎ, 'দো শো রূপেয়া দিয়ে ও আমায় মোলাই করে এনেছে, বাবুজী। স্যামসন আমার মালিক।'

মন্মথর পেখম-তোলা ময়ূর তার পেখম-গোটানো চিকন দেহটা হেলিয়ে ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে চলে যায়।

বিজলী বাতির আলোয় একটা বেড়াল-বাচ্চা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বাঘটাও হাঁক দিচ্ছে খেলার তাঁবুতে। হাততালির জোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে মন্মথ। এবার আয়ারের বাঘের খেলা।

হঠাৎ এই কলরব, সার্কাস, আয়ার, স্যামসন—সব যেন অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে মন্মথর।

*

*

দেবল সেই যে প্রথম দিন এসে চলে গেল, তারপর মাত্র একদিন আর এসেছিল, সার্কাস যেদিন সুরু হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারু আর মন্মথর সঙ্গে খেলা দেখেছিল কিছু কিছু। আয়ারের বাঘের খেলা আর লীলাবতীর সাপের খেলাও।

মন্মথ আর চারু যখন খুব তারিফ করছে আয়ারের—দেবল ঠাট্টা করে বললে, 'শেরের বাচ্চা শিরাজী, কি বল্ মন্মথ?'

'আলবাৎ। ইস্, ও কি চারটিখানি কথা রে? কথায় বলে বাঘের

আঁচড়—সেই বাঘের সঙ্গে বেটা দিব্যি গলায় গলা লাগিয়ে পড়ে থাকল।’

‘কি তাগদ্!’ দেবল অট্টহাসি হাসল, ‘দামোদর নদীর পারে যে শেয়ালগুলো আছে, বুঝলি চারু, তাদের চেহারাও ওই বাঘটার চেয়ে বহুৎ ভাল। তাগদও বেশি।’

‘হ্যাঁ’, চারু বিজ্ঞের মত বলে, ‘সার্কাসের ডালভাত, পাঁটার ছাল আর আফিং খাওয়া বাঘ, তার চেহারা আর কত হবে রে? তবু—বাঘ তো! বলা কি যায়, ও শালা যা ফেরোসাস্ জন্তু, কখন রক্তের স্বাদ পেয়ে দাঁত বসিয়ে দেয়?’

‘দাঁত আছে তো? বুড্ডা হ’লে দাঁত ভি পড়ে যায়।’ দেবল আরও জোরে হাসতে থাকে।

‘শোন্ চারু—শোন্। শালার ফুটুনি সুরু হ’ল।’ মন্মথ অসন্তুষ্ট হয়।

খানিক পরে দেবল বলল, ‘তোরা খেল্ দেখ, আমি চল্লুম।’

‘এরই মধ্যে যাবি কোথায়? দাঁড়া—।’ মন্মথ বাধা দেয়।

‘ভাগ। এ সব রদ্দি জিনিস দেখার সময় নেই আমার, শখও নেই।’

‘রদ্দি? বেশ বাবা, রদ্দি। আমি এনে বসিয়েছি কিনা, তাই তোদের কাছে সবই রদ্দি, বাজে হয়ে গেল।’ মন্মথর গলায় বেশ একটু অভিমান, ‘দেব শালা, কালই সব হঠিয়ে দেব। আমার পঞ্চাশ-শ’ যা গেছে ফালতু—যাক্।’

দেবল হাসতে হাসতেই মন্মথর গলা জড়িয়ে ধরে, ‘এ্যাঁ, খুব যে গোসা

রে! ছো ছো, সার্কাস ওঠাবি কেন? দেখ্, যদি দু-দশ টাকা আসে। আমি দো-চার দিনের বাস্তে রানীগঞ্জ যাব। কাম আছে থোড়া।'

সেই যে গেল দেবল, আর ছায়াও মাড়াল না ভাটিখানার। রানীগঞ্জ যাওয়ার কৈফিয়তটা সম্পূর্ণ মিথ্যে না হ'লেও একেবারে ঠিক সত্যিও নয়। কোনো দরকার ছিল না দেবলের রানীগঞ্জে; এমনি একবার ঘুরে আসা, পুরনো চেনা-জানা লোকের সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ করে আসা।

রানীগঞ্জ থেকে ঘুরে এল দেবল। একবেলার জায়গায় পুরো দুটো দিন কাটিয়ে দিল। ফিরে এল নিজের ডেরায়। সকাল বেলায় সাদা উর্দি পরে অ্যাশলে সাহেবের গাড়ি নিয়ে বেরোয়। পাশে, সিটে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে জলি—পিট্‌পিট্‌ চোখে চায়। সাহেবের অফিসের সামনে শিশু-গাছের তলায় গাড়ি রেখে রোজকার মত বসে থাকে দেবল, না হয় পায়চারি করে। খেলা করে জলিকে নিয়ে। বিড়ি-সিগারেট ফোঁকে। একে-তাকে ডেকে দু-দশটা কথা বলে কখনো হয়তো।

সকালে যেদিন অ্যাশলে সাহেব কারখানা বা এখাদ-ওখাদে যান, দেবল তবু যেন খানিকটা কাজ পায়। নয়তো চুপচাপ বসে থাকা।

সকাল তবু কাটে, দুপুরও। কিন্তু বিকেল যেন আর কাটতে চায় না। একেবারেই একা। ফাঁকা ঘর, কথা বলার লোক নেই, কাজ করার মতনও কিছু নেই হাতে। এই সময়টা ভীষণ মন মুষড়ে পড়ে দেবলের। জলিকে মুঠোয় ধরে নদীর পথে বেরিয়ে পড়ে। শহর থেকে মদ কিনে

এনে রেখেছে, পকেটে ঢুকিয়ে নেয় বোতলটা। ভাটিখানার দিকে পা বাড়াতে একেবারেই নারাজ ও।

লোকের মুখে 'লিল্লার সার্কাসে'র গল্প-গুজব শোনে দেবল। শোনে আর চুপ করে থাকে।

আসলে মন্মথর সার্কাসের দল এনে পাথরচটিতে বসানো বরদাস্ত করতে পারছে না দেবল। একেবারেই সহ্য হচ্ছে না মন্মথ আর চারুর এই রদ্দি সার্কাস নিয়ে এত মাতামাতি। মূর্খ হ'লেও দেবল অল্প-স্বল্প যতটুকু ভাবতে পারে, তাতে ওর স্থির বিশ্বাস, সার্কাস বসানো একটা ধাপ্পাবাজি, জোচ্চুরি। জুয়া খেলার মতনই ওর নেশা। পাথরচটির গরীব ঘর-গেরস্থি, ছুতোর, কামার, পাওয়ার হাউস আর খাদের যত ফিটার, মিস্ত্রী, বয়লার-ম্যান, গ্রামের চাষা-ভুষো, বাউরী, ডোম, মুচি, সাঁওতাল—সব পাগলা হয়ে ভাটিখানার তাঁবুর কাছে ছুটছে রোজ সন্ধ্যাতে। পয়সা উড়োচ্ছে আর চা, পান, বিড়ি, সিগারেট ফুঁকছে। সব শালার নেশা ধরে গেছে সাপবালী ছুঁড়িটাকে দেখে। বেহুঁশ হয়েছে বুদ্ধুর দল।

'কি রে বেটা—' দেবল জলির লোম-ভরতি কান দুটো আদর করে নাড়তে নাড়তে বলে, 'তোর চাচাজী ফাঁকিবাজির কারবার এনে বসিয়ে দিল। দো হাতে শালারা পয়সা লুঠছে। আচ্ছা হ্যায়—ইয়ে? বোল বেটা, আচ্ছা হ্যায়?'

জলি মৃদু কেঁউ কেঁউ শব্দ করে। দেবল যেন সেই ভাষা বুঝতে পেরে খুশী হয়ে ওঠে, 'ঠিক—বহুৎ ঠিক; এ আচ্ছা কাম নেহি।'

একটু পরে আবার জলির মুখটা নিজের দাড়িতে ঘষতে ঘষতে সোহাগ

করে দেবল বলে—'গরীব আদমির পয়সা ঠকিয়ে নিতে নেই, বেটা—পাকা শয়তানীর কাম ও।'

জলি হাতের মুঠো থেকে ছিটকে বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে দেবলের। লোমশ বুকটায় মুখ ঘষে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

ছাদের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে জলির গায়ে হাত বুলোয় দেবল। নরম তুলোর বলের মত ছোট্ট জীব, কিন্তু আশ্চর্য মোলায়েম। দেবলের কঠিন হাতের তালু সেই মসৃণ লোমের স্পর্শে ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসে। অদ্ভুত একটা শিরশিরে আনন্দ, চোখ-মন-বোজা তন্দ্রা যেন স্নায়ু থেকে বুক পর্যন্ত আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায়। সঙ্গোপন আনন্দটুকু একা একা শুয়ে শুয়ে উপভোগ করে দেবল, হাতের আঙুল কটা খালি জলির লোমে জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করে।

হপ্তাখানেক পরে দেবল গেল চারুর বাড়ি। চারু নেই। বকুল বেতের মোড়া এগিয়ে দিয়ে বসতে দিল।

'চারু কাঁহা, চারু-বউ?'

'যেখানে থাকে।' বকুল বলল মৃদু স্বরে।

'সার্কাস—?'

'হ্যাঁ। বাড়ি তো ফেরে না আজকাল।'

'রাতমে ভি ফেরে না?'

বকুল মাথা নাড়ল। দেবল দেখল সেই মাথা নাড়া। শীতের সন্ধ্যায়

পঁচিশ পাওয়ারের ম্লান আলোয় বকুলের কৃশ বেদনাসিক্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেবল চুপ। মুখ ফিরিয়ে তাকাল ও উঠানে; তুলসী গাছের গোড়ায় একটি প্রদীপ তখনো জ্বলছে মিটিমিটি।

বকুল বলল, 'একটু ব'স, দেবল ভাই। চা করে আনি।'

চা খাওয়ার মতন আর মেজাজ ছিল না দেবলের। কিন্তু তবু না বলতে পারল না। অনেকদিন পরে এসেছে চারু-বউয়ের কাছে, চা না খেলে কষ্ট পাবে বেচারী।

চা আর মুড়ি এনে দিল বকুল।

চা খেতে খেতে দেবল প্রশ্ন করল, 'তবিয়ৎ তোমার আচ্ছা নেই, না চারু-বউ?'

'না তো। ভালই আছে।'

'ঝুটা বাত্। বোখার হয়েছে তোমার?'

'না, না, জ্বর হবে কেন? শীতকাল, ঠাণ্ডাতে সর্দি হয়েছে। তাই—।'

আবার একটু চুপচাপ।

'তুমি সার্কাসে যাও না, দেবল ভাই?'

'না।'

'কেন?'

'ভাল লাগে না।'

'সে কি?'

বকুল ম্লান হাসি হাসে, 'তোমাদের তিন বন্ধুর দু'জনের খাওয়া-ঘুম

'সব বন্ধ, আর তোমার ভাল লাগে না? তোমাদের ভিন্‌রুচি তো আগে কখনো দেখি নি, দেবল ভাই?'

দেবল সে কথার কোনো উত্তর দিল না। একটু পরে বকুল ঠাট্টা করে বলল, 'বুঝেছি, বাঘের খেলা, সাপের খেলা যারা দেখাচ্ছে সার্কাসে তারা নাকি সব বড় বড় বীর হনুমান, নিজেও তুমি বীর কিনা, তাই তোমার সে বীরত্ব ভাল লাগে না।'

কথাটা দেবলের মরমে গিয়ে বিঁধল। চায়ের গেলাস থেকে মুখ তুলে ও বকুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

পথে আসতে আসতে বকুলের কথাটাই বারবার মনে পড়ছিল দেবলের। ঠিকই বলেছে চারু-বউ। দেবলের একদমই ভাল লাগে নি আয়ারদের নিয়ে চারু-মন্মথর অত নাচানাচি। অযথা এ হৈ-হুল্লোড়। দেবল বুঝতেই পারে না, খেঁকশেয়ালের মত একটা হাড়সার, মরা বাঘের খেলা দেখায় যে, সেই আয়ারকে নিয়ে কিসের এত নাচানাচি? আছে কি ওই বাঘটার? কতটুকু জান আছে বেচারীর? আর ওই আয়ার, শালা যেন কোন্ বাদশা! দেড় বিত্তের তো বুক, বেঁটে কুঁদকো বেড়াল—তার আবার রোয়াবী কি, যেন শাহানশা! সাপবালী ছুঁড়িটাও দিব্যি ওর গা ঘেঁষে বসে থাকে!

সারা রাত ঘুম হয় না দেবলের। যতই ভাবে ততই তার মেজাজটা বিগড়ে যেতে থাকে। হঠাৎ একসময় মনে হয়, চারু-মন্মথর আয়ারকে

নিয়ে অত নাচানাচি করা যেন তাকেই অবজ্ঞা করা। বন্ধুদের কাছে এমন অবজ্ঞা আর কখনো পেয়েছে কি দেবল? না।

তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পায়ের তলা থেকে ঘুমন্ত জলিকে তুলে নেয় দেবল। তার কান টেনে টেনে জাগিয়ে তুলে দেবল বলে, 'কার তাগদ জাদা রে বেটা, আমার না ওই কালা বিল্লিটার?'

জলি ঘুমকাতর স্বরে বার কয়েক কেঁউ কেঁউ করে দেবলের বুকের পাশেই টলে পড়ে।

'ঠিক। বিলকুল ঠিক কাহা হ্যায় বেটা। আমার এক পাঞ্জায় ও শালা শের-খেলানো পাঁচটা আয়ারকে রুখতে পারি।'

পরের দিন বিকেলে দেবলের খেয়াল হ'ল, তাই তো চারু-বউয়ের অসুখ! কেমন আছে চারু-বউ? চারু শালা কি ফিরেছে কাল? যদি চারু-বউয়ের বোখার বেড়ে গিয়ে থাকে, তবে?

বিকেল শেষে দেবল চারুর বাড়ি গিয়ে হাজির। যা ভেবেছিল দেবল, ঠিক তাই। চারু ফেরে নি। চারু-বউয়ের জ্বর বেড়েছে। ভীষণ কাশছে বেচারী, চোখ-মুখ লাল।

দেবল বললে, 'কিশোরী কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে তোমায় দাবাই এনে দি, চারু-বউ। আচ্ছা দাবাই। তুরন্ত্ ভাল হয়ে যাবে।'

'দরকার নেই, দেবল ভাই। এ সর্দি-জ্বর; কালই ভাল হয়ে যাব।'

'মগর দাবাই খাও না। কি লোকসান তাতে? হোমিও দাবাই; তিতা ভি নয় খেতে।'

'কোনো ওষুধেরই দরকার নেই।' বকুল হেসে বাধা দেয়। কথা

ঘুঁরিয়ে বলে, 'তোমার বন্ধুর খবর পাই না। তিনদিন বাসায় ফিরল না। ভাবনা হয় না আমার, বলো তো? আশ্চর্য লোক!'

বকুলের জ্বরতপ্ত শীর্ণ শুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে দেবল কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ঘাবড়াও মত্, চারু-বহু। আজ আমি শালার টুঁটি পাকড়ে নিয়ে আসব।'

উঠে পড়ল দেবল। সার্কাসের তাঁবুতেই যাবে সে।

প্রথম দফার খেলা শেষ হয়েছে; দ্বিতীয় দফায় স্বরু হচ্ছে সবে শ্যামসনের রিঙের খেলা—এমন সময় দেবল এল সার্কাসের তাঁবুতে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চারু বা মন্মথ কাউকেই দেখতে পেল না। অনুমানে ও এল ছোট তাঁবুতে। তাঁবুতে ঢোকার মুখের কাটা পর্দার একটা পাশ ফেলা ছিল, আর একটার অর্ধেকটা ছিল গুটোনো। দেবল মাথা গলিয়ে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই ওর পা গা সব যেন নিমেষে কঠিন হয়ে এল। এক পাশে একটা খাটিয়ার ওপর শতরঞ্চি বিছানো—আয়ার তার ওপর শুয়ে আছে। খাটিয়ার মাথার দিকে বাঁ পাশ ঘেঁষে একটা এলানো চেয়ার—সেই চেয়ারে গা এলিয়ে রয়েছে লীলাবতী। সাপের খেলা দেখানো পোষাকটা তার অঙ্গে। মাথার চুলে বকের পালক। আর চারু নেশায় একেবারে টইটুম্বুর হয়ে লীলাবতীর পায়ের কাছে বেতের মোড়ায় বসে বসে ঝিমুচ্ছে—মাতলামি-হাসি হাসছে। সামনেই ভাঙা গোল টেবিলের ওপর দিশী মদের বোতল।

বিজলী বাতির অনুজ্জ্বল আলোটা এই ছোট্ট তাঁবুর পক্ষে যথেষ্ট। সেই

আলোয় দেবল সমস্ত দেখতে পাচ্ছিল পরিষ্কারভাবে। বুঝতে পারছিল, চারু, লীলাবতী, আয়ার তিনজনেই নেশায় মশগুল। লীলাবতীর সাজ যত-না, গা-এলানো বিলাসী ভঙ্গীটা তার চেয়ে শতগুণ মাদকতা ভরা। চারু হেলে পড়ে একটা কুত্তার মত লীলাবতীর পুরু মাংসল পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। যেন পা চাটছে জিভ দিয়ে।

আধ-বোজা চোখে লীলাবতী আমেজ করে সিগারেট ফুঁকছিল আর মাঝে মাঝে একটা হাত বাড়িয়ে চারুর মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো করে দিয়ে হাসছিল আপন মনে।

দেখতে দেখতে দেবলের সর্বাঙ্গে আগুন ধরে উঠল।

'চারু !'

মোটা গলায় হাঁক পাড়ল দেবল। তাঁবুর মধ্যে যেন বাঘ ডাকল আচমকা।

চমকে উঠে তাকাল লীলাবতী; আয়ারও আধবসা অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে চাইল। চারু শুধু আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে দেখল দেবলকে নির্বিকারভাবে

'উঠে আয় ইধার—' দেবল বজ্রস্বরে ডাকল আবার। ইঙ্গিত করল কাছে আসার।

চারু উঠল না। জড়ানো গলায় জবাব দিল, 'কি বলছিস বল্ ?'

'এখানে আয়। শালা, কুত্তা কাঁহাকার! ঘরে বউটা বোখারে মরছে আর হারামি তুই এখানে বসে মজা লুঠছিস ? চলে আয় জলদি—!'

তবু চারু ওঠে না, মাতলামি হাসি হেসে বলে, 'আমার বউ ফউ নেই—। আই অ্যাম এ্যালোন্।'

দ্বিতীয়বার আর বাক্য বিনিময় করে না দেবল। ক' পা এগিয়ে গিয়ে খপ্ করে চারুর একটা হাত ধরে ফেলে, হেঁচকা টান দেয়। চারু বেতের মোড়া থেকে ছিটকে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ায় টলমলে পায়। দেবল তাকে টানতে টানতে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

দু-তিন পা মাত্র এগিয়েছে দেবল—হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকার করে লীলাবতী তার হাতের ওপর শকুনির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আচমকা দেবল সামলাতে পারে না। চারুর হাতটা ওর হাত থেকে খসে যায়।

লীলাবতী চারুকে ছিনিয়ে নিয়ে ধরে রাখে। যেন ওর ধন কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছে কেউ, আগলাতে চাইছে। অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটা চারুকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রণচণ্ডী মূর্তিতে তাকিয়ে থাকে। কি যেন বিড় বিড় করে আপন মনে।

প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই দেবল এক পা এগিয়ে লীলাবতীকে সরিয়ে দিতে যায়। ঝাপ্টা-ঝাপ্টি করে লীলাবতী, দেবলের হাতে কামড় বসিয়ে দেয়—জোরে। ততক্ষণে চারুর হাত আবার ধরে ফেলেছে দেবল। বাঁ হাত দিয়ে লীলাবতীর বুকে এক ধাক্কা দেয় ও। সরিয়ে দিতেই চেয়েছিল দেবল, কিন্তু দেখা গেল ধাক্কা খেয়ে মাতাল মেয়েটা লট্পটিয়ে আয়ারের খাটের পাশে গিয়ে পড়েছে। ককিয়ে উঠেছে তীব্র স্বরে।

লীলাবতীর বিশ্রী তীক্ষ্ণ চীৎকারে কান না দিয়েই দেবল চারুকে টানতে টানতে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার কাঁধে এসে কি একটা লাগল

যেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দেবল। মুখ ফিরিয়ে দেখে, আয়ার টেবিল থেকে মদের বোতলটা তুলে ছুঁড়ে মেরেছে তাকে লক্ষ্য করে।

চারুর হাত ছেড়ে দিল দেবল। মদের বোতলটা পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

ছোট্ট তাঁবুর দুই প্রান্তে দুই বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে এতক্ষণে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে দেবল। শ্যেন দৃষ্টিতে দেখছে আয়ারও। পরস্পরের চোখ পরস্পরকে একদৃষ্টে পর্যবেক্ষণ করছে। ঠিক যেন ক্রোধোন্মত্ত দুটি হিংস্র পশু আক্রমণের পূর্বে অপেক্ষা করছে সুযোগের। ক্ষুদে ক্ষুদে দুটি চোখ ঝকঝক করছে আয়ারের, কুটিল পাংশু দীপ্তি, দাঁতে দাঁত চাপা। ঝোলা ঝোলা ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে রয়েছে। বাঁ গালের ক্ষতটা কুঁচকে আরও কুশ্রী হয়ে উঠেছে এখন। দেবলের সর্বাঙ্গ কালবৈশাখীর মেঘের মতন থমথম করছে। ঘোলাটে ভাবটা কেটে গিয়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক রক্ত-উজ্জ্বলতায় লাল হয়ে উঠেছে তার দুই চোখ।

আয়ারকে এগিয়ে আসতে হ'ল না, পা পা করে এগিয়ে গেল দেবলই। পরক্ষণেই একটা আসুরিক আক্রমণ করল আয়ার। আর একটু হ'লেই দেবলের একটা হাতই হয়তো ঘাড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেত। আয়ারের আক্রমণকে বিফল করে দেবল আশ্চর্য তড়িৎ গতিতে পাশে সরে গেল এবং চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আয়ারের ওপর। ওদের দ্রুত সরব নিশ্বাস পতনের ভারী শব্দ অল্প কিছুক্ষণ শোনা গেল, তারপর দেখা গেল দুহাতে আয়ারকে শূন্যে তুলে তাঁবুর একপাশে ছুঁড়ে দিল দেবল। কী যেন ভেঙে পড়ল, শব্দ হ'ল গুরুভার পতনের, আয়ারের মর্মান্তিক

একটা চীৎকার তাঁবুর বাতাস চিরে বাইরে মিলিয়ে গেল। লীলাবতীও ডুকরে উঠল ভয়ে।

ক্ষ্যাপা মোষের মত দেবল দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার সরব শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ উঠছিল হাপরের মত। ঝড়ের দোলার মত ওঠা নামা করছে ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি।

আয়ারের ওঠার সুদূর কোনো সম্ভাবনা নেই বুঝে দেবল আবার চারুর হাত ধরল। নেশা ছুটে এসেছিল চারুর। কোনো কথাটি আর বলল না।

চারুর হাত ধরে দেবল তাঁবু ছেড়ে চলে গেল। যন্ত্রণায় আয়ার তখন কাতরাচ্ছে, আর লীলাবতী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝ তাঁবুতে। বকের পালকটা মাথা থেকে খসে পড়েছে মাটিতে। রঙ-করা মুখেও ভয়ের পাংশু ছায়া।

আয়ারের চোটটা কিছু কম লাগে নি। কনুই-এর কাছে ডান হাতটার হাড় সরে গেছে। মাথা কেটেছে বেশ খানিকটা, পায়েও লেগেছে জোর। হাত-মাথা ফুলিয়ে, সর্বাঙ্গে টনটনে ব্যথা নিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছে আয়ার। যন্ত্রণায় দাঁত কিড়মিড় করে চেঁচায় আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেয় দেবলকে।

বাঘের খেলা বন্ধ। ফলে সার্কাসই বন্ধ হবার যোগাড়। বাঘই তো আসল; যে সার্কাসে বাঘ নেই তার আবার কিসের খেলা, কিসের মোহ! লোকের ভিড়টা হঠাৎ কমে আসে। আগে যেখানে খেলার তাঁবুতে তিল

ধারণের জায়গা থাকত না, এখন সেখানে তক্তা আর বেঞ্চিগুলো খালি পড়ে থাকে—চেটাইগুলো পর্যন্ত ভরে না। দুদিনের দিনই সার্কাস বন্ধ করে দিল লীলাবতী।

গালে হাত তুলে ওরা চুপচাপ বসে থাকে। মন্মথর ইচ্ছে নয়, লীলাবতী সার্কাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় এত তাড়াতাড়ি। থাক না দু-পাঁচ দিন বন্ধ সার্কাস। কতদিন আর লাগবে আয়ারের সেরে উঠতে। তারপর আবার খেলা দেখালেই চলবে।

মন্মথর আসল আগ্রহ অবশ্য সার্কাসের খেলার ওপর নয়। কৃষ্ণার ওপর। ভাবটা আরও একটু জমে উঠেছে ওদের। এমন সময় চট করে কৃষ্ণাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না মন্মথর। মন্মথ ভেবেছে, দুশ'র জায়গায় ও তিন, চার, পাঁচ শ' পর্যন্ত টাকা দিতে রাজী আছে শ্যামসনকে কৃষ্ণার বিনিময়ে। কিন্তু শ্যামসন যদি দিয়েই দেয় কৃষ্ণাকে, কি করবে মন্মথ? কোথায় রাখবে তাকে, কিভাবে রাখবে? সমস্যাটা জটিল—। সমাধানও হয়তো হবে না কিছু, তবু থাক না কৃষ্ণারা আরও ক'টা দিন। তবু তো খানিক নতুন আনন্দ, নতুন স্বাদ আর বৈচিত্র্য।

চারুর মনোভাবও অনেকটা মন্মথরই মতন। তারও ইচ্ছে নয় লীলাবতী সার্কাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। বরং মন্মথর চেয়ে চারুই বেশি গরজ দেখায় এ ব্যাপারে। লীলাবতীকে নানা ভাবে বুঝোয়।

আসলে চারুকে কেন্দ্র করে যে বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল তাতে যেন মরমে মরে যাচ্ছে চারু। সর্বদাই তার মনে হয়, এই কেলেঙ্কারির জন্যে সেই দায়ী। আয়ারের ওপরেও মাঝে মাঝে খাপ্পা হয়ে ওঠে ও।

লীলাবতীকে বলে, 'তোমার ওই হাঁদারাম আয়ারটাই যত নষ্টের মূল। কি দরকার ছিল প্রথমেই হাত তোলার? ঠিক হয়েছে।'

'তোমার দোস্তই কি কম কসুর করেছে চারুবাবু?' পাল্টা জবাব দেয় লীলাবতী, 'তুমি ঘর যাও, না যাও, ওর কি আছে? বউ তোমার, না তোমার দোস্তের?'

লীলাবতীর কথার জবাব দেয় না চারু। এই নিয়ে তার মনেও কিছু কম ক্ষোভ নেই। রীতিমত একটা কথা কাটাকাটিই হয়ে গেছে বকুলের সঙ্গে পরের দিনই।

'দেবলাকে তুমি কান্নাকাটি করে লাগিয়েছ?'

'না।' বকুল দৃঢ় স্বরে আপত্তি জানায়।

'না তো, ও গেল কেন?'

'আমি কি জানি তার!' স্বামীর ওপর বকুলের অভিমান এতই তীব্র যে, গলার স্বরটা তার উপেক্ষার মতন শোনায়।

চারু চটে ওঠে। বলে, 'আলবাৎ তুমি জানো।'

'বেশ, তবে জানি।'

চারু আর সামলাতে পারে না নিজেকে। বকুলের হাতটা চেপে ধরে চাপ দেয়, 'আমি বাড়ি ফিরি না-ফিরি সে আমি বুঝবো। দেবলা তোমার কে? কিসের জন্যে তার সঙ্গে তোমার এই ষড়্?'

'সার্কাসের সেই মেয়েটাই বা কে তোমার? তার সঙ্গে তোমার অত মেলা-মেশা কেন?' স্ত্রীর দাবী নিয়ে আজ কঠিন ভাবেই হঠাৎ জানতে চায় বকুল। সবই সে শুনেছে।

চারু এতটা আশা করে নি। বকুলের মুখের দিকে চেয়ে যত অবাক হয় ততটাই নির্দয় হয়ে ওঠে অকস্মাৎ। বকুল কি তার ওপর মাতব্বরী ফলাতে চায়?

'সার্কাসের সেই মেয়েটা আমার ভালবাসার লোক, বুঝলে?'

বকুলকে যেন কেউ একটা চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। ফ্যাকাসে, যন্ত্রণা-কাতর মুখে ছলছল চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল বকুল। কি যে বলবে কিছুই ঠাওর করতে পারলে না।

খানিকটা সয়ে নিয়ে বললে বকুল, 'আমাকে দায়ে পড়েই না হয় বিয়ে করেছো, তবু তো আমি তোমার বউ!'

'হ্যাঁ বউ বই কি, তবে সাতপাকের বউ নয়, কালীঘাটে বিয়ে করা বউ—এ কথাটা মনে রেখো। অত আদিখ্যেতা তোমার সাজে না।'

'সত্যিই তো'—বলল বকুল অনেকটা পরে, অস্ফুট গলায়। তারপর কান্নার আবেগ চাপতে ঘর ছেড়ে দালানে চলে গেল।

পরে অবশ্য বকুলকে এতগুলো কঠিন কথা বলার জন্যে চারুর একটু দুঃখ হয়েছিল। তবে সেটা তেমন কিছু নয়। পরের দিনই আবার বিকেল হতে না হতে চারু সেজেগুজে সার্কাসের তাঁবুর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। আসার সময় বললে বকুলকে, 'রাত্তিরে আমি ফিরতে নাও পারি। খবরদার কিন্তু, দেবলার কাছে সোহাগ করে শোক গেয়েছ! আবার যদি ও যায়—তবে কিন্তু ফল ভাল দাঁড়াবে না—সে আমি তোমায় বলে রাখলুম।'

এই ঘটনার পর বকুলের ওপর থেকে মায়াটুকুও যেন তার উবে গেছে। চারু ভাবে, সে কি ছেলেমানুষ! বকুলকে যদি ভাল না লাগে, টেনে

নিয়ে গিয়ে ঘরে বসিয়ে দিলেই চারুর মন বদলে যাবে? নেহাতই উজবুক দেবল, তা না হ'লে বুঝত, লীলাবতীকে চারুর ভাল লেগে গেছে। খুব ভাল লেগেছে। নয়তো কেন আসবে চারু এখানে? সার্কাস সে দেখে না; দেখার কোনো আগ্রহই নেই তার। একমাত্র আকর্ষণ লীলাবতী। লীলাবতীকে যতই দেখছে চারু, ততই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ছে দিন দিন। এমন মোহই যেন সে চাইছিল এতদিন!

বাতাসে ওড়া পালকের মতন অস্থির, স্থিতিবিহীন জীবনের আশ্চর্য একটা ইঙ্গিত আর লোভ নিয়ে লীলাবতী তাকে হাতছানি দিচ্ছে। চারু তার মোহ অস্বীকার করতে পারে না; পারবেও না।

এদিকে সার্কাসের খেলা বসাবার দরুন কোলিয়ারীর কাছ থেকে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই নিয়েছিল মন্মথ দশ দিনের কড়ারে, নিয়েছিল বিজলী-তার, বালব্‌, এটা-ওটা। সে দশ দিনের আয়ু শেষ। কোম্পানিকে নামমাত্র কিছু টাকা দিতে হবে ভাড়া হিসেবে। লিল্‌লা সার্কাস এক পয়সাও দেয়নি মন্মথকে। তার ওপর দিনও শেষ। নতুন করে পারমিসান না নিলে কাল পরশুই লোক এসে সব খুলে নিয়ে যাবে। অথচ পারমিসান দেবার মালিক খোদ অ্যাশলে সাহেব।

'আচ্ছা ঝঞ্ঝাটে ফেলল রে চারু? বলতো এখন করি কি—?' গালে হাত তুলে বললে মন্মথ।

চারুও চিন্তিত। 'সত্যি, এখন কি করা যায়!'

মন্মথ আবার বলে, 'শালা দেবলাই আমাদের ডুবোলে! দেমাক

দেখেছিস একবার—মুখ দেখাই একেবারে বন্ধ করে দিলে! ও না হ'লে কে এখন বলে সাহেবকে ?'

'তা ঠিক।' চারু মাথা নাড়ে, 'একবার গিয়ে বলতে পারলে অবশ্য সাহেব হুকুম দিয়ে দেবে—লোক তো খুবই ভাল রে, তবে যায় কে ?'

'তুই যা না।'

'আমি ?' চারু হাত নাড়ে, 'না বাব্বা, আমি ওতে নেই। কে জানে কি মেজাজে থাকবে, ভাই। আজ ছ'বছরে একটি দিনও কথা বলি নি—সেরেফ সেলাম ঠুকেছি।...আমার কাজ কি, তুই যা না, মন্মথ।'

'আমি ?' মন্মথ চোখ বড় বড় করে বিস্ময় জানায়, 'আমি যাব কিরে ? ইংলিশে কথাই বলতে পারব না।'

'ইংরেজীতে কি দরকার, হিন্দী বাংলা যাতে খুশি বলবি, অ্যাশলে সাহেব সব বোঝে।'

'না, আমার দ্বারা উ হবে না।' মন্মথ মাথা নাড়ে। কি ভেবে হঠাৎ বলে আবার, 'আচ্ছা ধর, দেবলা যা চটা কি-না সার্কাসের ওপর যদি মাইরি সাহেবকে বাগড়া দেয়, তবে তো শালা সব গেল!'

চারু চোখ তুলল,—এ কথাটা একবারও ওদের মনে হয় নি কেন ? লীলাবতীও মুখ তুলে তাকাল মন্মথর দিকে।

খানিকটা চুপচাপ। তিনজনেই ভাবছে। কথাটা, মন্মথ যা বলেছে তা মোটেই উড়িয়ে দেবার মতন নয়। লীলাবতী অবশ্য প্রথমে জানত না, পরে জানল; কিন্তু চারু মন্মথ ত জানে দেবলাকে ধরেই প্রথমবার সার্কাস বসানোর পারমিসান পেতে হয়েছে সাহেবের কাছ থেকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও

দেবল বন্ধুদের অনুরোধ রেখেছে সেবার। স্টোর থেকে মাল নেবার ঢালাও• হুকুমও সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে দিয়েছিল দেবল। কিন্তু এবার? আর কি সে রাজী হবে?

লীলাবতীও ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এতদিনে। বেশ দু-পয়সা আসছিল—আয়ারের মূর্খতার জন্যে সব যেতে বসেছে। সার্কাস, টিকিটঘর সবই তো ফাঁকা এখন—।

অবশেষে লীলাবতী বললে, 'চলো বাবু, আমরা ওর কাছে যাই।'

'কার, দেবলের?'

'হাঁ; দেবলের। আমি যাব, তোমরাও চলো। ডর লাগে তোমাদের?'

মন্মথ হেসে ফেলে হঠাৎ। জবাব দেয়, 'ভয় আমাদের নয় গো, লীলাবতী; আমাদের হাত-পা ভেঙে ঠুঁটো করে দেবে না ও, সে ভয় নেই। ভয় তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে ঘাবড়িওনা তোমরা বাবু। চলো, আমার বাঁচবার রাস্তা আছে।' লীলাবতী কথা শেষ করে রহস্যময় হাসি হাসে।

পরের কাহিনীটুকু খুবই বিচিত্র।

প্রায় সন্ধ্যে করে লীলাবতী এল দেবলের কাছে, সঙ্গে চারু আর মন্মথ। চারুর তো রীতিমত ভয় ভয় করছিল। কিন্তু বাহাদুর মেয়ে লীলাবতী। ভয় ডর দূরে থাক—এমন সহজ ভাবে ও দেবলের মুখের দিকে তাকিয়ে তরলকণ্ঠে হেসে উঠে পাশটিতে জায়গা করে বসে পড়ল—যা দেখে মন্মথ

আর চাকুর চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। দৃকপাত করলে না লীলাবতী কোনো দিকে। দিব্যি জাঁকিয়ে বসল, হেলে পড়ল দেবলের গায়ে, হাত ধরে ফেলল থপ্ করে। বললে, 'বেহুঁস আওরাৎ তো তোমায় কাটেনি, জী—বেকুফী দিল্‌লগী করেছে, এতনা থোড়াতেই তুমি গোসা হবে কে মালুম করেছিল। মাফি মাঙছি। বাস্ রে বাস্—আমায় তাজ্জব্ বানালে—আদমি না শের তুমি। অ্যয়সা যোয়ান, মরদ, তাগদ্ দোসরা একভি দেখলাম না।'

লীলাবতী তার অশোভন দেহসজ্জাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে ফাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বসল। দেহের অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ আশ্চর্য ভাবে লোভনীয় করে তুলে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল ওর। মন-ভিজানো মিষ্টি কথা আর মন-টলানো চটুলতায় অল্পক্ষণের মধ্যে দেবলের নিস্পৃহতাকে জয় করে ফেললে। বশীকরণের রহস্যটা যেন অনেক আগে থেকেই ধরতে পেরেছিল লীলাবতী।

যাদু করে ফেলল দেবলকে এই যাদুকরী। হাসি থামিয়ে চটুলতা সরিয়ে হঠাৎ করুণ হয়ে উঠল ও। কৃপাপ্রার্থীর মতন বললে, 'পেটের জন্যে এখানে এলাম, জী! দো দশ টাকা হচ্ছিল—আজ চার রোজ ধরে সব ফাঁকা। দশ পনেরো জন লোক আমরা ভুখা মরছি। গরীবদের রোটি নিও না, জী। আউর এক হপ্তা বসতে দাও আমাদের, ফির কোন্ আসছে ইধার?'

লীলাবতীর কথায়, ভাবে-ভঙ্গীতে দেবল বশ হ'ল। হয়ত এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। কিন্তু এমন আশ্চর্য নিয়েই তো মানুষ। যার মনের মধ্যে শক্তির দম্ভ সুপ্ত হয়ে আছে, অহমিকা উগ্র হয়ে রয়েছে, তার কানে

লীলাবতীর মতন নারীর মধু-স্বরের পর্যাপ্ত প্রশংসা ভাল লাগবে বৈকি। খুশি হ'ল দেবল, রাজী হ'ল। যে দেবল সার্কাসের ছায়া মাড়াত না, সেই দেবলই সাহেবের কাছ থেকে আরও দশ দিনের পারমিসান চেয়ে দিল, নিজেই এল তাঁবুতে। ভিড়ে গেল সকলের সঙ্গে; এক আয়ার বাদে।

দেখা গেল দেবলের মেজাজটাই বদলে গেছে। বেশ হাসিখুশি মেজাজ। লীলাবতীর সঙ্গে তার কথাবার্তা হচ্ছে, হাসি ঠাট্টাও। লীলাবতীও যেন দেবল-অনুরক্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। খুব তোয়াজ করে দেবলের। আর সত্যি কথা বলতে কি সার্কাসের তাঁবুতে সকলেই কেমন যেন দেবলের প্রতি অহেতুক একটা সমীহের ভাব দেখাতে লাগল। সব দেখে শুনে চারু, মন্মথ দুজনেই বেশ অবাক হয়। এতটা তারা আশা করে নি।

মন্মথ চারুকে চোখ টিপে বলে, 'দেখছিস তো কাণ্ডটা! দেবলা শালাও গলে জল হয়ে গেছে।'

'যাবে না, যা খাতিরের ঘটা; ঢলাঢলি। আসলে ওর অহঙ্কারে লেগেছিল—; এখন সব তো তেল দিচ্ছে ওর পায়!' চারু জবাব দেয় অখুশি গলায়।

দিন দুয়েক পরে লীলাবতী মন্মথকে বলল, 'বাবু, কাল থেকে আবার খেলা বসিয়ে দি।'

'আয়ার পারবে খেলা দেখাতে?' মন্মথ পাল্টা প্রশ্ন ক'রল।

'না।' মাথা নাড়ল লীলাবতী, 'বাঘের খেলা বন্ধ থাক। এমনি খেলা চলুক। যা দো-দশ টাকা আসে। নয় তো ভুখা মরতে হবে আমাদের।'

'দূর দূর।' বাধা দিল চারু, 'একটা তো শুকনো বাঘ, তাও যদি দের্‌ না করো ও বাবা সার্কাস চলবে না।'

লীলাবতী চারুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে দেবলের দিকে তাকায়। ঠোঁটের গোড়ায় হাসি টেনে বলে, 'নসিব আমার। ভুখা মরতেই হবে। আয়ারকে তুমি এত্‌না জখম করলে জী, বেচারী মালুম দো-চার মাস আর বাঘের খেলা দেখাতে পারবে না। হিম্মৎ আছে তোমার, সাচ্চা শেরের হিম্মৎ।'

লীলাবতীর গলায় প্রশংসার সুর ছিল। এ সুর আজ ক'দিন থেকেই থাকছে। দেবলের কানে তা যায়। আর শুধু যায় না, ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিটা জামার মধ্যে ফুলে ওঠে। সুপ্ত অহমিকা তৃপ্ত হচ্ছে ওর। তার কদর বুঝেছে সাপবালী মেয়েটা! মিটিমিটি হাসি হাসে দেবল। কোলের ওপর থেকে জলিকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোয়।

'শেরের হিম্মৎ যদি থাকে তা হ'লে বাঘের খেলাটা তুই দেখা না দেবলা?' চারু বলে আনমনে। কেমন যেন একটা ঈর্ষান্বিত সুরে।

চারুর মুখের কথাটা টপ করে লুফে নেয় দেবল।

'পারি না, নাকি রে শালা?'

'পারিস?' চারু তখনও ঠাট্টার সুরে কথা বলছে।

'আলবাৎ। তোর মতন মুরগির হাড় নাকি আমার, কবুতরের বুক? আছে কি ওই বাঘটার।' দেবল বিন্দুমাত্র রসিকতা করছে বলে মনে হয় না।

'বেশি ফুটুনি করিস না, দেবলা।' চারুও চটামটা গলায় নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করলে, 'বাঘের খেলাও তুই দেখাবি—? যত হামবড়াই!'

'তো কি আমি তোর মতন মাগী না কি? আলবৎ বাঘের সামনে দাঁড়াতে পারি, আর না পারি তো বাপের বেটা নয়। আয় বাজি—আয়—!' দেবলও উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিয়ে হাত বাড়াল; বাজি ধরার আহ্বান জানিয়ে!

'বেশ, বাজি। দশ টাকা—না দশ নয়, বিশ—। যা শালা, এক মাস না হয় না' খেয়েই মরব।' চারু হাতে হাত মিলিয়ে দেবলের আহ্বানে সমর্থন জানাল।

'ঠিক হ্যায়! কালই।'

কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেল। সকলেই বিহ্বল। মন্মথ যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে চীৎকার করে উঠল, 'না—না, বাজি-টাজি চলবে না। খবরদার দেবলা, সব তাতে ইয়ারকি ভাল নয়। গোঁয়ারতুমির মাত্রা আছে।'

লীলাবতীও প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। দুই বন্ধুর হাঁকাহাঁকির পরিণাম অনুধাবন করতে খানিকটা সময় লাগল তার। শেষে দেবলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'দুই দোস্তে বাজি ফেললে তোমরা। বাত কিন্তু দোসরা। শেরের সামনে তুমি যাবে কি ক'রে? পুলিস দিয়ে হাত কড়া লাগাতে চাও আমাদের। না, ভুখা আছি; ভুখাই থাকব। বে-আইনী কাম করে পুলিসে যেতে পারব না।'

লীলাবতীর কথাটা চারু বুঝল, মন্মথও বুঝতে পারল। বুঝল না দেবল। তার মানে? আমি যাব বাঘের সামনে—কার কি তাতে! পুলিস কিসের?

অগত্যা যে চারুর সঙ্গে দুমিনিট আগে বাজি ফেলাফেলি হয়ে গেছে, সেই চারুকেই বুঝোতে হ'ল আইন-রহস্য।

বেশ একটা আঁচ লেগেছিল বুকে, হঠাৎ যেন সব মিইয়ে গেল! মুষড়ে পড়ল দেবল। হিম্মৎ দেখাবার এতবড় সুযোগ ব্যর্থ হয়ে যাওয়া কি কম কথা? তাছাড়া লীলাবতীকে সে আরও অনেক কিছু দেখাতে চায়, কতটুকু আর দেখেছে সে—কি আর এমন পরিচয় পেয়েছে ও দেবলের শক্তি সম্পর্কে। পাঁচ—পাঁচটা আয়ারও যে দেবল সিং-এর কাছে কিছু নয়, এ কথাটুকু অন্তত লীলাবতী ভাল করে বুঝুক।

গুম মেরে গেল দেবল। ছুট-ছাট কথা চলতে লাগল চারু আর মন্মথতে। লীলাবতী চুপটি করে আড় চোখে চোখে দেবলকে দেখতে লাগল শুধু। আর মাঝে মাঝে দেবলের পিকিনিজ কুকুর জলিকে সোহাগ করে ডাকতে থাকে জিভের জল টানা আওয়াজ করে। যেন কুকুর নয়, কুকুরের মালিককেই সে ডাকছে, ছলাকলায়।

পরের দিন দুপুরেই হঠাৎ দেবল সার্কাসের তাঁবুতে এসে হাজির। কিসের একটা উদ্দীপনায় তার কৃষ্ণাভ নীল চোখের তারায় আলো ঠিকরে পড়ছে। মন্মথর সঙ্গেই প্রথমে দেখা।

'মতলব এসে গেছে রে, মন্মথ।' দেবল খুশীর চোটে খই-ফুটছে, 'আজ সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাইরি মেমাকে চলে এল। শোন, আমি—গাড়ি রুখব।'

'গাড়ি রুখবি?' আচমকা শোনা কথাটা মন্মথ ঠিক বুঝতে পারে না।

'হ্যাঁ, গাড়ি, ছ' সিলিণ্ডারের গাড়ি। স্টার্ট দিয়ে নিয়ে যা তুই আমার সামনে থেকে, দেখি কত মুরদ তোর? রানীগঞ্জে মহাবীর ঝাণ্ডার দিন একবার রুখতে দেখেছিলাম। দেবল স্ফূর্তির চোটে মন্মথর পিঠে থাপ্পড় কষিয়ে দিল, 'বাঘের খেলা কিরে শালা—ও তো পোষ মানান বাঘ। আয়, রোখ দেখি গাড়ি? মেসিন তো আর আফিং-খাওয়া পশুর বাচ্চা নয়। দেখি হিম্মৎ তোর।'

'গাড়ি রুখবি তুই?' মন্মথ আবার বলে বিহ্বল হয়ে।

'আলবৎ। আজই। একটা গাড়ি চাই। আচ্ছা, সে সব ঠিক করে নেব। চারু শালাকে গাড়ি চালাতে শিখিয়েছিলাম। ও শালাই বসবে গাড়িতে। ফাঁকিবাজির কারবার নয়।' দেবল একটু থামে, 'চারু কই—?'

'খাদে গেছে বোধ হয়। কিন্তু, তুই কি সত্যি গাড়ি রুখবি? হঠাৎ এ খেয়াল কেন?'

খেয়াল কেন! দেবল মন্মথর দিকে তাকায়। সত্যি তো তার এ খেয়াল কেন? উত্তর খুঁজে পায় না দেবল। কিছুক্ষণ মন্মথর দিকে বোকার মতন তাকিয়ে থেকে বলে, 'কি আছে ওতে রে, খুশী হ'ল। দেখই না থোড়া। তোর সার্কাসের এক নতুন খেলা বাড়ল।' কথার শেষে দেবল অদ্ভুতভাবে হাসে।

শীতের দুপুরের মিঠে রোদে লীলাবতীকে দেখা যায়। মন্মথ কিছু বলবার আগেই দেবল পা চালিয়ে এগিয়ে গেল তারই দিকে।

অযথাই বাকফট্টাই করেনি দেবল। সত্যি সত্যি ছ' সিলিণ্ডারের

সেভ্রলো গাড়ি রুখেছিল ও। ব্যাপার দেখেশুনে শ্যামসনদের চক্ষু-স্থির। চারু তো স্টিয়ারিং হাতেই বসেছিল, স্টার্ট দিয়ে ব্রেক ছেড়ে ক্লাচ টিপে দিল নিজের পায়েই।

সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তার নিজেরই। সে নিথর, হতবাক। হাততালির ঝড়ের মধ্যে হঠাৎ চারুর খেয়াল হয়, এ প্রশংসা তাকে নয়, দেবলকে। বাঘের বাজিতে না হ'লেও, আসল বাজিতে সত্যিই দেবল জিতে গেল। হেরে গেল চারু। একটা নির্জীব খেলনার মতন গাড়িতে সে বসে রয়েছে, কেউ তাকিয়েও দেখছে না তাকে। দেখবেও না, আর। অকস্মাৎ অদ্ভুত একটা ঈর্ষা ফেনিয়ে ওঠে চারুর বুকে। ক্লাচ আর এক্সিলেটারের ওপর পা দুটো যেন তার বশ মানতে চায় না, শয়তান হয়ে ওঠে। হাতের মুঠোয় গিয়ারটা একটা ছোরার বাঁটের মত হিংস্র প্রলোভনের স্পর্শ যুগিয়ে রক্ত চঞ্চল করে তুলছে। দেবে নাকি এক্সিলেটার আরও দাবিয়ে, টপ্‌গিয়ারে গাড়ি তুলে—? হাততালির ঝড় থেমে একটা মারাত্মক আর্তনাদ তা হ'লে কি উঠবে না এই মুহূর্তে?

···না—না—না। প্রাণপণ কষ্টে নিজেকে সংযত করে ব্রেক কষে দেয় চারু। স্টার্ট বন্ধ করে দেয়। গাড়ির মধ্যেই মুখ ঢেকে বসে থাকে। সারা মুখে ঘাম জমে উঠেছে। ঝিমঝিম করছে মাথা। ধক্‌ধক্ করছে বুক। বড় অবশ বড় ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। কোনরকমে নেমে, মুখ নীচু করে, অবশ পায়ে চারু চলে যায়—সোজা ভাটিখানার আড্ডাঘরে।

লীলাবতীর সাপের খেলাও আর জমল না সেদিন। কেউ যেন আর পাত্তা দিল না তেমন। দেবলকে নিয়ে হৈ হৈ।

পরের দিন বাতাসে খবর ছড়িয়ে গেল পাথরচটি, মধুবন আর রাধানাথপুরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। আবার দেখাতে হবে খেলা। তারা দেখেনি মোটরের খেলা; তাদের লোক দেবল সিং; দাবি আছে বৈকি ওদের। দেখাও, খেলা দেখাও আবার।

মন্মথ বললে, 'লে, ঠেলা সামলা এইবার; ভিড়ের চোটে ভির্মি লেগে গেছে আমার।'

'পরোয়া কিসের?' দেবল অকাতরে লীলাবতীর এগিয়ে দেওয়া পানপাত্রে চুমুক দিয়ে জবাব দেয়, 'দেখাব খেলা। মগর দো দিন। কাল, পরশু।'

তাই সই। শুধু সাপের খেলা দেখতে টিকিট কেটে ঢুকবে না কেউ। পয়সা অত সস্তা নয়। আসবে সব কালই।

দেখতে দেখতে সার্কাসের তাঁবু ফাঁকা হয়ে যায়।

আসর জাঁকিয়ে বসেছে এবার দেবল সিং। যেন ছত্রপতির রাজতিলক কপালে এঁকেছে, জয়পত্র লুটিচ্ছে পায়ের কাছে। লীলাবতী তার নর্মসহচরী; মন্মথ, চারু সভাসদ, বয়স্য। ছোট তাঁবুতে বিজলী বাতির আলোয় অদ্ভুত রোমাঞ্চময় রাত্রি এসে জুড়ে বসেছে কোন সুক্ষণে। দেবল সিং তার হিসেবনিকেশ করে না; করার কোনো কারণও খুঁজে পায় না। শুধু দেখে বকের পালক চুলে গুঁজে লীলাবতী অর্ধ-বাস দেহে তার গা ঘেঁষে বসে রয়েছে। এমনিভাবেই বসে ছিল নেশাময়ী এই যাযাবরী সেই দিনও—আয়ারের গা ঘেঁষে—দেবল যেদিন প্রথম তাকে দেখে। আর

আজ? আজ আর আয়ার নয়, দেবল। এমনটাই যেন চেয়েছিল দেবল মনে মনে।

পঁচিশ ওয়াট্‌স্ পাওয়ারের বাতিতে দেবল সব স্পষ্ট দেখতে পায়। অনুভবও করতে পারে অনেক কিছু। মন্মথ ঝিমোচ্ছে। চারু মাথা এলিয়ে লুটিয়ে পড়েছে; ক্লান্ত মুখ। নেশায় আচ্ছন্ন। শ্যামসন বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। এতক্ষণে সমস্ত নিস্তব্ধ। সব চুপ।

বকের পালকটা খসে পড়েছে লীলাবতীর দেবলের হাতের ওপর। আস্তে আস্তে পালকটা তুলে নিয়ে দেবল ঘুম-চোখ লীলাবতীর মুখের দিকে তাকায়।

লীলাবতীর নিটোল গ্রীবামূলে একটা কাল তিল স্থির হয়ে আছে। একটু একটু কাঁপছে ক'টি মাংসল রেখা, নিশ্বাসের দোলায় সুপুষ্ট বুক ওঠা-নামা করে, হাওয়া-লাগা শ্লথবন্ধ কপাটের মতন। অলস অগুছোল একটি বাহু দেবলের কোলের ওপর পড়ে আছে। পালকটা আস্তে আস্তে লীলাবতীর গ্রীবামূলে ছুঁইয়ে দেয় দেবল। অগুছোল হাতটায় নিজের হাত রাখে। পিকিনিজ কুকুরের লোমের মতন মোলায়েম মসৃণ অনুভূতি। গা শির শির করে ওঠে দেবলের।

ক্ষণিক চমকে চোখ খুলে তাকায় লীলাবতী। চিবুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে। সুর্মা টানা চোখের পাতা আরও যেন টান-টান হয়ে কি বিভ্রম সৃষ্টি করে। উঠে বসে লীলাবতী। আস্তে আস্তে হাত ধরে দেবলের। উঠে দাঁড়ায়, আকর্ষণ করে মাদকতা-মাখা অঙ্গভঙ্গিমায়।

চুপ, আচ্ছন্ন তাঁবুর আলো থেকে পা টিপে টিপে লীলাবতী দেবলকে

নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে আসে। শীতের কনকনে হাওয়া বইছে, ঘন কুয়াশায় সব আড়াল হয়ে গেছে, শীর্ণ চাঁদ উঠেছে আকাশে।

লীলাবতীর আকর্ষণে দেবল এগিয়ে যায়। কোথা থেকে একটা উৎকট গন্ধ ভেসে আসে নাকে। বাঘের খাঁচাটা হয়তো সামনেই। নজর পড়ে না। আর এক শূন্য তাঁবুতে মাথা গলিয়ে লীলাবতী বাতি নিভিয়ে দেয় নিজের হাতেই।

অন্ধকার। কে, কোথায়—কেউ জানে না। লীলাবতীর হাত অন্ধকারেই দেবলের হাতে এসে মেলে। কে যেন টেনে নেয় তাকে। গলায় বাহু বেষ্টন করে লীলাবতী মধুর স্বরে মদিরতা ছড়িয়ে দেয় বাক্যের আর ওষ্ঠের। দেবল যেন কেঁপে ওঠে প্রথম শীত লাগা শিশুর মত। কূজন স্তব্ধ হয়ে যায়। ছ' সিলিণ্ডারের সেভ্‌রলো-রোখা বুকের ওপর সাপবালী মেয়েটা ছড়ানো তুলোর মত লুটিয়ে ছিটিয়ে পড়ে। বুকটা শুধু তাপ লেগে ধক্ ধক্ করে।

অন্ধকারে আর একটা জিনিসও ধক্‌ধক্ করে জ্বলছিল—তাঁবুর বাইরে। দেবল দেখেনি। আয়ারের দুই চোখ। একটা আহত পশু হিংস্র চোখে তাকিয়ে ছিল দাঁতে দাঁত চেপে।

এমনি হয়। যতক্ষণ নেই, নেই ; যে যাবৎ জানি না কি আছে, ততক্ষণ ভিখিরী ; যত সময় ঘুম, তত সময় অচৈতন্য, অজ্ঞান। যে মুহূর্তে জানতে পারলুম আমি আছি, আমার আছে, ঘুম ভেঙে জেগে বসলুম ; তখন আর

অচৈতন্য নই। চেতনায় সেই মুহূর্তে আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর সেই আগুনেরই খেলা। মানুষ কি জানতো তার মধ্যে কত অফুরন্ত শক্তি আছে? জানতো না। যুগ যুগ তাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে; যে দিন জানল সে দিন থেকে রসাতল আর নভঃস্থল সর্বত্র তার সহস্র বাহু মেলে দিয়ে মত্তমনে তার শক্তির খঞ্জনি বাজিয়ে চলেছে।

কণ্ট্রাক্টারের ইটের লরী চালানো কিম্বা মিঃ অ্যাশলে গ্রীনের নতুন মডেলের ফোর্ড গাড়ির স্পীডোমিটারে স্পীডের কাঁটাটাকে পঞ্চাশের ওপর তুলে দেওয়াকেই তার শক্তির চরম বলে এতকাল জেনে এসেছে দেবল। তারপর হঠাৎ তার মধ্যেই এক আবিষ্কার ঘটে গেল। নিজের মধ্যেই সে দেখল, গাড়ি চালানোই নয়, গাড়ি রোখার ক্ষমতাও তার আছে। আর তার এই ক্ষমতাকে লোকে অবাক হয়ে দেখে, বাহবা দেয়। এমন কি লীলাবতীও তাতে চমৎকৃত। নিজেকে নতুন করে মূল্য দিতে শিখল দেবল; আবিষ্কার করল, সে অনন্যসাধারণ, চারু-মন্মথ থেকে

বীরভোগ্যা বসুন্ধরার তত্ত্ব কথাটা নিশ্চয়ই দেবল জানত না। কিন্তু তার মর্ম কথাটা ওর অনুভূতির নাগালের বাইরে নয়। হয়তো তাই প্রথম দিনই ভাটিখানার-আড্ডাঘরে আয়ারকে দেখে তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, লীলাবতীকে আয়ার-ভোগ্য হতে দেখে অসহ্য বিতৃষ্ণা এসেছিল তার।

ঘটনাক্রমে লুকানো সম্পদ আবিষ্কারের মতনই দেবল নিজেকে আবিষ্কার করল। রক্তে ওর আগুন ধরল, চোখে ধরল রং আর মনে নেশা।

আত্মমোহে মত্ত হয়ে ওঠাই তো স্বাভাবিক এ ক্ষেত্রে। দেবলও বাদ পড়ল না। গাড়ি আটকানোর খেলা তিন দিন থেকে সপ্তাহে গিয়ে ঠেকল। টিকিট ঘরে ক্যাশের বাক্স টেনে বসতে হ'ল মন্মথকে নিজেই। সমস্ত পাথরচটির চোখে দেবল যেন হঠাৎ এক পরমাশ্চর্য নতুন নক্ষত্র হয়ে দাঁড়াল রাতারাতি।

দেবল সিং খুশী। শুধু খুশীই নয়, প্রেরণায় প্রখর, দীপ্ত। লীলাবতী আজ তার ছায়াসঙ্গিনী। বশ্যতা স্বীকার করেছে সাপ-খেলান দাম্ভিক যুবতী—এ সত্যও দেবল অহোরাত্র অনুভব করে আর অসহ্য পুলকে বিভোর হয়ে থাকে।

দেবলের চোখেই পড়ে না, বাঘের গাড়িটা রোজ একটু একটু করে সরিয়ে এনে লীলাবতীর তাঁবুর কাছে রেখেছে আয়ার। গলার সঙ্গে ঝুলনো ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে ঠায় সে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে খাঁচার সামনে; চুপচাপ দু-এক টুকরো মাংস, হাড় মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দেয় বাঘটাকে, আর নীরবে সব দেখে। রাত্রের অন্ধকারে হিংস্র দুই চোখ তার লীলাবতীর তাঁবুর বাইরে অযথাই জ্বলে না রোজ।

লীলাবতী আর দেবলের এই নৈশ-লীলা নীরবে দেখে যাচ্ছিল আর একজন। সে চারু। মনে মনে পুড়ছিল, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেনি।

মন্মথই খুঁচিয়ে কথা তুলত।

'ব্যাপার কিরে চারু? দু'জনে যে দিব্যি মজে গেছে রে!'

'তাইত দেখছি।' চারুর ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণতা।

'যা ব্যাপার-ট্যাপার দেখছি, শেষ পর্যন্ত ওই সাপ-খেলানো ছুঁড়িটা দেবলাকে নিয়ে না ভেগে পড়ে!'

'ভেগে পড়বে?' চারু চমকে ওঠে।

'যা কিনা টালমাটাল দেখছি রে, তা দলে টেনে নিয়ে ভেগে গেলেই বা কি! তবু দেবলা থাকলে সার্কাসে দুপয়সা আসবে।'

'তা ঠিক। তবে শুধু দেবলাতে পয়সা আসবে না, একটা ভাঙা ফুটো গাড়িও চাই। লীলা সার্কাসের ক্ষমতায় তা কুলোবে না।' চারু বিচক্ষণের মতন বলে আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। একটু থেমে আবার, 'তা ছাড়া আমার? ও কি আর সহজে ছেড়ে দেবে—?'

চারুর কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করলে মন্মথ। ও যা আশঙ্কা করছিল তা হওয়া সম্ভব নয় দেখা যাচ্ছে।

'যা বলেছিস।' মন্মথ চারুর হাতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে বলে, 'অত ঝটপটের পর পাখি উড়ে যাবে ঠিক; দেবলা শালাই তখন ছটফটিয়ে মরবে।' দেবলের মনের ভবিষ্যৎ অবস্থাটা ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্মথ যেন নিজের অবস্থাটাও হঠাৎ আঁচ করতে পারে। কি যেন ভাবে মনে মনে, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'বেশ ছিলাম, মাইরি। এ শালা সার্কাসটা না বসালেই ছিল ভাল!'

লীলাবতীর ঘন-সান্নিধ্য ছেড়ে দেবল ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাইকেল চেপে অ্যাশলে সাহেবের বাঙলোর উদ্দেশে পাড়ি দেয়। সারাদিন সাহেবের

গাড়িতে কেটে যায়। সন্ধ্যের মুখে আবার সে আসে সার্কাসের তাঁবুতে। তার অবর্তমানে সার্কাসের তাঁবুতে কি ঘটে যায় দেবল তা জানে না। জানা সম্ভবও নয়। জানতেও চায় না কিছু।

রাত্রের আলোয়, অন্ধকারে, শীতলতায় লীলাবতী দেবলকে উষ্ণ সান্নিধ্য দিলেও—দিনের আলোয় বহুবার তাকে আয়ারের মুখোমুখি হ'তে হয়। আর শুধুই মুখোমুখি নয়, তাদের মধ্যে এমন অনেক কথাবার্তা হয় যার আভাসটুকুও অন্য কারুর কানে যায় না। এ সময়টা এরা দুজনেই খুব সতর্ক। কথা বলে আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে, মনের ভাবটা মুখের ভাষায় যথাসাধ্য গোপন করেই।

টাকা নিয়ে দুজনায় গণ্ডগোল বেঁধে গেল সেদিন। আয়ার বললে, 'সব টাকা আমার জিম্মায় দাও।' লীলাবতী সটান মাথা ঝাড়া দিয়ে টাকা জিম্মা রাখতে অস্বীকার জানালে। বললে, চারুবাবু হিসেব করছে। টিকিটের টাকার ভাগ বাটরা করে ওদের টাকা ওদের দিয়ে দিতে হবে। দেবল শেষ বাত বলে গেছে। বাপ্‌রে বাপ্—ও দুষমনটার সঙ্গে বাতের খেলাপ্ করে মরবে নাকি লীলাবতী।

আয়ার বিশ্বাসই করতে চায় না লীলাবতীর কথা। লীলাবতীও গ্রাহ্য করে না আয়ারের সন্দিগ্ধতা। বলে, 'ঠিক আছে, চারু দেবল আসুক—ওদের পুছে নিও।'

চারু আসতেই সেদিন লীলাবতী তাকে আড়ালে ডেকে নিল।

'কি মতলব?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে চারু সুধোয়।

জায়গাটা নির্জন এবং আবছা আঁধারে ভরা। লীলাবতী চারুর হাত ধরে ফিস ফিস করে একদমে কতকগুলো কথা বলে যায়।

বিস্মিত হয়ে চারু বলে, 'আয়ারের জিম্মায় তুমি টাকা রাখতে চাও না! কিন্তু কেন? বিশ্বাস করো না ওকে?'

'না। ওর মতলব খারাপ।'

'তোমার?'

'আমার মতলব তুমি জানবে চারুবাবু। আজ কি কাল রাতমেই। থোড়া সবুর করো।'

চারু স্পষ্টভাবে কিছু বুঝতে পারে না। অনুমান করে দেবল ও লীলাবতীর ঘনিষ্ঠতা উপলক্ষ করে বড় রকমের একটা ভাঙন ধরে গেছে দুই অংশীদারে। একটু অপেক্ষা করে চারু বলে, 'আমার জিম্মায় টাকা রাখবে, কিন্তু আমি যদি ভেগে পড়ি।'

'ভাগতে পারবে তুমি?'

'না পারার কি আছে।'

'বউ?'

'ঘর ছেড়ে পিয়ারের লোকের সঙ্গে ভেগে এসেছিল; আমায় পাকড়ে ফেলল রাস্তায়। কাঁদতে লাগল। আমিও বউ বানিয়ে নিলাম। ভেগে পড়লে অন্য লোক ধরবে।' নির্বিকার ভাবে বলে গেল চারু।

লীলাবতী সেই আবছা অন্ধকারে চারুর চোখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে একবার তাকাল।

'বউকে পিয়ার করো না?'

'না।'

'কাহে?'

'মন চায় না। আয়ারকে তুমি বিয়ে করনি কেন? ওকেই বা কেন তুমি পিয়ার করো না, লীলাবতি?' চারু পাণ্টা প্রশ্ন করে ম্লানভাবে হাসল।

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল লীলাবতী, 'সাপ শয়তান, শেরভি শয়তান। আট সাল এই দু' শয়তান নিয়ে আমি খেলেছি, চারুবাবু। এই দুনোই দুষমন, বেইমান। পাকড়ালে আর জিন্দগীতে ছাড়বে না তোমায়, মুঠ্‌টিতে রাখবে, মারবে। আপনা কাম হাসিল করবে। শয়তানকে পিয়ার করা যায়, চারুবাবু?'

একটু চুপচাপ। চারু হঠাৎ বললে, 'দেবল ত শয়তান নয়, লীলাবতি!'

'ওর মুঠ্‌টির আউর জোর, চারুবাবু। একবার ফাঁসলে জিন্দগীই বরবাদ। বেকুফ যোয়ান।'

কথা শেষ করে লীলাবতী আস্তে চারুর হাতটা চেপে ধরল। সার্কাসের তাঁবুতে অনেক বাতি জ্বলে উঠেছে ততক্ষণে।

সেদিনও লীলাবতীর তাঁবু অন্ধকার। শীতের রাত গভীর হয়ে এসেছে। অত্যুষ্ণ দুটি দেহ ঘন-সান্নিধ্যে, নেশায়, মাদকতায় গভীর রাতের মতনই অসাড়। নিঃশব্দ পায়ে কে যেন তাঁবুর ভেতর এসে ঢোকে। সাপ চলার মত অতি মৃদু খস খস একটা শব্দ হয়। ফসফরাসের মতন দুই চোখ জ্বলে, কি যেন খোঁজে লোকটা। একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আসার সময়

তাঁবুর দরজার পর্দা উঠিয়ে দিয়ে আসে। তাঁবুর মধ্যে অসাড় একটি দেহ অপরের সান্নিধ্য বিচ্ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত হাতে খুঁজে নেয় গরম শাল, আরও যেন কি এখান ওখান থেকে; তারপর নিঃশব্দে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে যায় ছায়ার মতন। অন্ধকারে মিশে যায়।

বাঘের খাঁচার তালাটা খুলে ফেলেছে আয়ার। প্রচণ্ড শীতের চাবুক-হাওয়া বইছে দমকা। ঘন কুয়াশায় মাঠ ঘাট অদৃশ্য। পাওয়ার হাউসের ক'টা বাতি ম্লান ভাবে জ্বলছে দূরে। শীর্ণ চাঁদের আলোয় সার্কাসের বড় তাঁবুটাও আবছা দেখায়।

এক হাতেই দাঁতে দাঁত দিয়ে খাঁচার দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে দেয় আয়ার। তাঁবুর দরজার পর্দাটা খোলাই আছে। খোলাই আছে পথ। কোমর থেকে এখন যেন হাণ্টারটা খুলে নিয়েছে আয়ার। গোড়াটা টিপে ধরেছে বাঁ হাতের দৃঢ় মুঠিতে—ঠিক যেন কারুর টুঁটি টিপে ধরেছে। একটু আড়ালে সরে এসে হঠাৎ আয়ার হাণ্টার চালায় গায়ের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে উন্মত্তের মতন। ওর সেই হিংস্র চাবুকের অদ্ভুত বাতাস-কাটা শব্দ ক্রুদ্ধ নাগিনীর ছোবল-মারা গর্জনের মত শোনায়। ক্ষুধার্ত বাঘটাও ঘুমন্ত তাঁবুর থমথমে নিস্তব্ধতাকে মুহূর্তে ভয়ঙ্কর করে হাঁক দিয়ে ওঠে। খাঁচা থেকে লাফিয়ে পড়ে না জন্তুটা সহজে। আয়ারকে বুঝি তারও অবিশ্বাস। সামনেই পর্দা-গুটনো উন্মুক্ত-পথ তাঁবু। দেবল তখনও নেশায় বেঘোর হয়ে লুটিয়ে রয়েছে।

অন্ধকারে সতর্ক দুটি চোখ জ্বলছে আয়ারের, অদ্ভুত একটা জ্বালায় সারা বুক জ্বলে যাচ্ছে তার। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ও। শালা বাঘটাও আজ খাঁচা

ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে না। হাতের হাণ্টারটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে আয়ারের।

কৃষ্ণা, শ্যামসনের দলের ঘুম ছুটে যায়। চমকে ওঠে মন্মথও। শ্যামসনের কেমন যেন সন্দেহ হয়। এমন করে তো বাঘটা ডাকে না, কোনো দিন। এত ঘন ঘন।

খাঁচা ছেড়ে বাঘ বেরিয়ে গেছে। চোখের পলকে তাঁবুতে তাঁবুতে খবর ছড়িয়ে পড়ে। শ্যামসন বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসে। চীৎকার করে, 'লাইট্—লাইট্। অল ডার্ক। কুছ দেখনে নেহি আতা হ্যায়। নিকালো মাত্ কোহি।'

মন্মথ অন্ধকারে হাঁক পাড়ে, 'চারু—চারু—দেবলা—'

কে যেন পেট্রম্যাক্স জ্বালানো কেরোসিন টিনের তেল তাঁবুর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে দেশলাই-এর কাঠি ছুঁইয়ে দেয়। কে? লীলাবতী না কৃষ্ণা? মন্মথ না চারু? দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেই দুরন্ত হিংস্র আলোর বন্যায় শ্যামসন দেখে বাঘের খোলা খাঁচার পাশে হাণ্টার হাতে পাথর-কাটা শয়তানের মূর্তির মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়ার। পাশবিক উল্লাস আর হিংস্র প্রতিশোধ স্পৃহায় সে এতই উন্মাদ যে, পালিয়ে যাবার কথাটাও ভুলে গেছে। ভুলে গেছে, লীলাবতীর সঙ্গে তার পালিয়ে যাওয়ার কথা। অপেক্ষা করছে লীলাবতী টাকার থলি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, অল্প একটু দূরে, ঝোপের আড়ালে। আর পালিয়ে যাবার পথ নেই, সময় নেই। দিন দুপুরের মত এই আলোর মধ্যে কোথায় পালাবে সে?

নিমেষে দাউ দাউ আলোয় ভাটিখানার ক্ষেত দিন-দুপুরের মত উদ্ভাসিত

হয়ে আসে। ভয়ার্ত চীৎকার আর ছুটোছুটি। কৃষ্ণার বড় ভয় হয়। শ্যামসন বন্দুক হাতে আলোয় আলোয় বাঘ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মন্মথ অস্থির হয়ে উঠেছে। আঃ, চারুটা কোথায় গেল, দেবলাটা কই? ইস্—শালা আগুনে আগুনে সব যে লাল হয়ে গেল। মাটি, আকাশ, বাতাস। পোড়া গন্ধ আর হল্কা আসছে—ভাসছে। মন্মথ পাগলের মত ছুটোছুটি করে—গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে—'চারু—চারু—দেবল—ও দেবলা। শালারা মরলি নাকি—সাড়া দিতে পারিস না, হারামির দল?'

কোথায় চারু? পাওয়ার হাউসের কাছাকাছি সাইডিং লাইনের আর পলাশ গাছের আড়ালে আড়ালে চারু আর লীলাবতী ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে দ্রুত পায়ে। পালিয়ে যাচ্ছে পাথরচটি ছেড়ে, সার্কাস ছেড়ে, সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে।

'ইস কি আগুন! সব লাল হয়ে গেছে! তোমার সার্কাস যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল লীলাবতী!'

'জাহান্নামে যাক্। আয়ারের শয়তানী শেষ করে দিয়েছি। ছাই নিয়ে খেল দেখাক দুষমনটা। ভাগতে পারবে না আর।' লীলাবতী পরম তৃপ্তির স্বরে বলে।

'কিন্তু দেবল?'

'আগ্‌কে ডর করে বাঘ—' লীলাবতী যেন সান্ত্বনা দেয় চারুকে।

শীতে চারু কাঁপছিল ঠক্ ঠক্। লীলাবতী তার গায়ের শালটা দিয়ে চারুকেও ঢেকে দিল, কাছে টেনে নিল।

পথ চলতে চলতে লীলাবতী বলল, 'তুমি রাস্তা না দেখিয়ে নিয়ে গেলে আমি পালাতে পারতাম না, চারুবাবু। প্রাণ বাঁচালে আমার তুমি। তোমার গোলাম হয়ে থাকব, জিন্দ্‌গী ভোর।' কথা শেষ করে লীলাবতী চারুকে শালের তলায় আরও একটু জড়িয়ে নিল। বুকে বুকে এক হয়ে গেছে ওরা। এক বুকের মধ্যে সযত্নে লুকানো কার্নিভালের জন্যে সযত্নে সঞ্চিত কিছু টাকা, আর আট বছর পরে কুৎসিত, হিম-পঙ্কিল যুগল স্পর্শ থেকে মুক্তি পাবার আশ্চর্য স্বাদ। অন্য এক বুকের মধ্যে সুধুই পথ চলার নেশা। এক থেকে আর একে ছুটে যাবার অদ্ভুত আকর্ষণ।

চারু কিছু বলল না। তার মনে পড়ল, ঠিক এমনিভাবেই বকুল একদিন হাওড়া স্টেশনে বলেছিল, চারু না বাঁচালে তাকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে হ'ত। চারুই তাকে বাঁচাল।

চারু আজও তাই ভাবছে, তার কাছে বাঁচতে চাওয়ার জন্যেই লোকে আসে কেন? চারু তো কাউকে বাঁচাবার জন্যে নয়, নিজে বাঁচবার জন্যে! বাঁচবার এই অসহ্য জ্বলনেই তার মন জ্বলছে—তাই না বকুল আর দেবল মন্মথকে পিছু ফেলে রেখে সে আজ পলাতক। বিশ্বাসঘাতকতা করল চারু, শয়তানী করল বকুল আর বন্ধুদের সঙ্গে। হ্যাঁ—করল বৈকি। ধক্ ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা আবার, বড় জোরেই এবার। অসহ বেদনাতেই। তবু হেঁচকা টান দিল লীলাবতীর হাতে চারু।

'তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

'লিল্লা সার্কাস' সার্কাস নয়, যেন ঝড়। দমকা এল, পাথরচটির শান্ত সহজ পরিবেশকে তছনছ করে দিয়ে চলে গেল। অবশ্য সার্কাস পার্টির যাওয়াটাও খুব সুখের হ'ল না। পুলিস দারোগা এল, অ্যাশলে সাহেব এলেন, আরও কত এ-জন সে-জন। আয়ারের হাতে হাতকড়া পড়ল; লীলাবতীর নামে ওয়ারেন্ট, চারুর নামেও নাকি! লীলাবতী আর চারু উধাও। কোথায় কে জানে? এতদিনে একটা সুযোগ জুটে যাওয়ায় লোকে বলাবলি করল, 'দেখলে তো, কি রকম বন্ধুত্ব, বাবা! এক মেয়েমানুষেই সব গিঁট ফস্‌কে গেল। আরে, একেই বলে সংসার। এক সীতাকে নিয়েই অমন রাম-রাবণে লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে গেল, তো চারু-দেবল-মন্মথ! হবেই জানতাম। এ আর নতুন কথা কি?'

কথাটা হয়তো নতুন নয়, কিন্তু মন্মথ-দেবলের কাছে নতুন বলেই মনে হ'ল। ওরা কল্পনাও করতে পারে নি—চারু এমন কাজ করতে পারে?

মন্মথ বলল, 'বুঝলি দেবলা, ও শালা নেমকহারাম, শয়তান। বউ গেল, এতদিনের বন্ধুত্ব গেল, কোথাকার এক বেউশ্যে মাগীই হ'ল তার কাছে বড়? আমি কিরে কাটছি, জন্মেও ও হারামির নাম করব না মুখে।

আর কোনদিন যদি শালাকে পাই, মাইরি বলছি, আস্ত রাখব না। শালা, শূয়ারের বাচ্চা, শয়তান।' অসহ্য রাগে কথাগুলো বলে মন্মথ আর ভাবে, এই চারুকে তার বাবা ভূষণ সাহা ভাবত—জাত দেবতা; কতই না ভালবাসত তাকে, বিশ্বাস করত! ইস, কি উঁচু ধারণাই ছিল শয়তানটার ওপর!… বাবার আর দোষ কি, ওরাই কি চারুকে কম ভালবাসত, না বিশ্বাস করত! কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, চারুকে যা ভাবা গিয়েছিল, সে তা নয়।

দেবল মুখে বিশেষ কিছু বলে না, মনে মনে যেন এ-সমস্ত কথাই ভাবে। ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে গেছে। নেশায় অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল দেবল লীলাবতীর কোলে মাথা দিয়ে। চেঁচামেচি, বাঘের ডাক আর আগুনের মধ্যে চোখ মেলে যা দেখল তাতে দেবলের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, হিমস্রোত বয়ে গেল সারা দেহে। পালিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই বাঘটা লাফ দিল। দেবল ততক্ষণে সরে এসেছিল—তবু ওর পায়ের ওপর ভারী একটা থাবা পড়ল, আর কিসে যেন আঁচড় বসিয়ে দিল। হাতের কাছে কিছু ছিল না—কিছুই দেখতে পেল না দেবল। বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে। কোনরকমে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল ও। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তখন। আগুনে গা ঝলসে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে আসে। টলতে টলতে কতটা পথ কিভাবে দেবল পেরিয়ে এসেছিল, আজ আর মনে পড়ে না। শ্যামসনের গুলিতে বাঘটা অবশ্য মরল; আর আহত দেবলকে সে রাত্রে ভাটিখানার ঘরে ফেলে রাখতে হ'ল। বাঁ পায়ের হাড় ভেঙেছে দেবলের, বাঘের আঁচড়ে সেপ্‌টিক হয়ে গেছে সারা পা, আগুনেও তার হাত পুড়েছে কিছু কিছু। জ্বর আর অসহ্য যন্ত্রণায় দেবল অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল

ভাটিখানার সেই আড্ডাঘরে। তারপর আর হুঁস নেই দেবলের। হুঁস হ'ল ক'দিন পরে—কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাড়িতে, নরম বিছানায় শুয়ে। চোখ মেলে দেখল পাশে—গৌরী। কিশোরী কম্পাউণ্ডারের ভাইঝি। আর একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে এল মন্মথ, সঙ্গে ডাক্তার।

ভাল ক'রে কিছুই যেন ভাবতে পারে না দেবল, অসহ্য কষ্টে কতকগুলো দিন আর রাত্রি কেটে গেছে। বিকারের ঘোরে দেবল লীলাবতী, আয়ার, চারুকে কতবার যেতে-আসতে দেখেছে—শুধুই দেখেছে।

আরোগ্যের পথে পা দিয়ে দেবল একে একে সব শুনল মন্মথর কাছে। শুনল নির্বিকারভাবেই। শুধু বলল, 'আমি বেহুঁস ছিলাম রে, আগর হুঁস থাকতো তো দেখতাম—'

'আর ও শালী—সাপবালী—সেরেফ সাপই মাইরি! কী সাজ্যাতিক!' চোখের ভুরু উঠিয়ে বলল মন্মথ।

দেবল সে কথার কোনো জবাব দিল না। সাপই বটে!

'আমার জলি?' দেবল প্রশ্ন করল।

'ঠিক আছে। দিয়ে যাব তোর কাছে। আজই।'

'দিয়ে যাস।...কিত্‌না দিন আর শুয়ে থাকবো রে, মন্মথ? তোর ডাক্তার বলে কি?'

'থাক্ শুয়ে এখনও মাস দেড়েক। পায়ের হাড় ভেঙেছে শালা—সেপ্‌টিকটাই যা ভাল হ'ল এত দিনে। তা থাক না শুয়ে, দিব্যি তো আছিস আরামে। কিশোরী কম্পাউণ্ডারের ভাইঝিটা খুব করল যা হোক তোকে। বাঁচিয়ে দিল। কম্পাউণ্ডার লোকটাও বড় ভাল রে।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেবল তাই দেখল।

কিশোরী কম্পাউণ্ডার লোক ভাল, এ কথা কোলিয়ারীর সকলেই বলত। কোম্পানির কম্পাউণ্ডার কিশোরী, সকাল-বিকেল ডিস্‌পেন্সারিতে থাকে—ফাঁকে-ফাঁকে কম্পাউণ্ডারি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি করে। হোমিও-প্যাথিতে তার খুব নামডাক। রুগী আসে কম নয়। বয়স হয়েছে কিশোরীর। তা প্রায় বছর পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। দোহারা চেহারা, কালো রঙ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা; আর সব সময় মুখজোড়া হাসি।

কিশোরী কম্পাউণ্ডারকে খাতির করার আরও একটা কারণ ছিল। যৌবন বয়সে কিশোরী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শোনা যায়, সে যুগে কিশোরী ছিল কেশরী। টানা পাঁচ বছর জেল খেটেছে বোমার মামলায়। জেলের বাইরে এসে কিশোরীর মতিগতি অন্যরকম হ'ল। কম্পাউণ্ডারি পাস করল, বই কিনল হোমিও-প্যাথি মোটা মোটা; তারপর গরিব দেশের গরিবদের মধ্যে ওষুধ বিলোতে বেরিয়ে পড়ল। কিশোরী আজও মোটা মোটা খদ্দরের কাপড়জামা পরে, ওর বৈঠকখানা ঘরে রুগী দেখার সাথে সাথে মজলিসি আড্ডায় খবরের কাগজ পড়ে পড়ে দেশের হালচাল বোঝায়। কিশোরীকে খাতির করে সকলেই—মায় অ্যাশলে সাহেবও। কোলিয়ারীর পাঁচ মুরুব্বির একজন এই কিশোরী। বিশেষ করে মালিকের কাছে আবেদন-নিবেদন, অভাব-অভিযোগ জানাতে-জানতে কিশোরী বই গতি নেই। মংরু ট্যাণ্ডেলের

ধাবড়া চাই পাঁচ ঘর, কোম্পানির বাজারে খাজনা নিতে গিয়ে হারু গোমস্তা কাকে ঠেঙিয়েছে, কার আনাজের ঝুড়ি সমেত তুলে নিয়ে চলে গেছে—তার সুপারিশ করতে হয় কিশোরী কম্পাউণ্ডারকে। কালীপূজো হ'ত কোলিয়ারীতে, এক পাই করে হাজরি কাটা যেত ছ'মাস—কিশোরী কম্পাউণ্ডারকে তাই নিয়ে লড়তে হবে। সেনগুপ্ত সাহেব বলতেন, 'কিশোরী বাবু, আপনি মশায় ডেজিগ্‌নেশনটা বদলে নিন্। লেবার ওয়েল-ফেয়ার অফিসার হয়ে যান, স্যানিটেশনের ভার তো কাঁধের ওপর আছেই —ক্ষতি কি ?'

কিশোরী কম্পাউণ্ডার হাসত। বলত, 'কি যে বলেন, স্যার !'

অ্যাশলে সাহেব বলতেন—অ্যাশলে কিংহাম কোম্পানির গোড়াপত্তনের সময় সাহেব যে অল্প ক'টি লোককে নিয়ে ঘোড়ার মত খেটেছেন, কিশোরী তাদের অন্যতম।...এ্যাণ্ড গুড্ ফেলো অল্‌ওয়েজ আস্কিং ফর ড্যাম্ ব্লিচিং পাউডার।

হ্যাঁ, কিশোরীর ওই এক মুদ্রাদোষ। ব্লিচিং পাউডার ইন্‌ডেণ্ট করাতে ও বিলি করতে ওর তুল্য লোক বোধ হয় আর কেউ ছিল না। কিশোরী বলত, 'প্রিভেনশন্ ইজ্ বেটার দ্যান কিউর, তাই না ? তবে ? ঘরদোর, ধাবড়া, ব্যারাক—সব সাফ-সুফ রাখ, রোগ কাছে ঘেঁষবে না।'

এ হেন কিশোরী কম্পাউণ্ডারই দেবলকে ভাটিখানার ঘর থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে আনল নিজের ঘরে। বলল, 'ও হে মন্মথ, আমার বাসায় পৌঁছে দাও সিংহীটাকে। এখানে থাকলে দেখাশোনা করবে কে ? ওর বাসাতেও তো লোকজন নেই। আমার বাসাতেই ধরাধরি করে দিয়ে

এস। গৌরী আছে, দেখবে—আর আমি তো আছি! সিংহীর প্রাণ, সহজে কি যেতে দেওয়া যায় হে?'

সেই থেকে দেবল কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাসায় আশ্রয় পেল। আর সেবা পেল গৌরীর।

জ্ঞান হবার পর দেবল প্রথম যার মুখ দেখেছে, সে মুখ গৌরীর। ঘোর চোখে প্রথমে মনে হয়েছে বুঝি লীলাবতী। পরে ভাল করে যখন দেখার মত চোখ আর মন পেল দেবল, বুঝল লীলাবতী নয়, গৌরী। লীলাবতীর তিলমাত্র ছায়া নেই এই মেয়ের মুখে, চোখে, গায়ে, মনে, কথায়-বার্তায়, হাসিতে; বরং গৌরী যেন অনেকটা চারু-বউয়ের মতন।

গৌরীর বয়স বেশি নয়, বোধ হয় বছর আঠারো হবে। একটু লম্বা মুখ। রং ফর্সা। চোখ দুটো বড় সুন্দর, কালো কুচ্‌কুচে টানা-টানা ভুরু। পাতলা ঠোঁট। টিকলো নাক। হাসলে সারা মুখে পাতলা-পাতলা কতকগুলো রেখা পুকুরের জল-কাঁপানোর মতন ছড়িয়ে পড়ে। কালো কালো একরাশ চুল গৌরীর। সে চুল কখনো এলো হয়ে পিঠময় ছড়িয়ে থাকে, কখনো সুন্দর একটি খোঁপা হয়ে লম্বা ঘাড়ের ওপর দোলে।

গৌরীর কথা বলার ভঙ্গী মিষ্টি, বলার কথাও যেন নতুন। দেবলের কাছে অন্তত সবই নতুন লাগে, আশ্চর্য মনে হয়। বিস্মিত দুই চোখ মেলে ও তাকিয়ে থাকে গৌরীর দিকে।

এমনি করেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে দেবল গৌরীকে, জ্ঞান ফিরে পাবার প্রথম দিন থেকেই। ওর জ্বরতপ্ত দেহে শীতল করতলটুকু রেখে

গৌরী কেমন করে যে বসে থাকল রাতের পর রাত, কোন্ আত্মীয়তায় প্রহরে প্রহরে ওষুধ আর পথ্য দিয়েছে দেবলকে, সেবা দিয়েছে প্রাণপাত করে—দেবল তা বুঝতে পারে না। ওর কাছে অবাক লাগে—অবাক লাগে, রোগা-গড়ন মেয়েটির অসঙ্কোচ এই আত্মীয়তা। আর একজনকে ঠিক এমনি দেখেছিল দেবল—সে চারু। অসুখ-বিসুখে, আপদে-বিপদে প্রাণ ঢেলে সেবা করতে অমন আর কেউ ছিল না। কিন্তু সেই চারু—তার বহুদিনের দোস্ত—শেষ পর্যন্ত নিমকহারামি করলে।

দেবলের পাথর-বুকটাও টনটন করে ওঠে। মগজের শিরাগুলোয় যেন স্পার্ক মারে, বুকটার গিয়ার বদলে যায়। ঘাড়ের প্লাগ্‌গুলো গরম হয়ে উঠে।

সার্কাসের দলটাই শয়তানের দল। শালারা সব দুশমন। বাঘ ছেড়ে দিয়েছিল দেবলকে মারতে। শেরকে কি ভয় পায় দেবল সিং? অমন দুটো শেরকে ও দু'হাতে রুখতে পারত। কিন্তু সোজাসুজি, মুখোমুখি বাঘ যদি এগিয়ে আসত, তবেই। লীলাবতী তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছলনা করে মদের নেশায় চুর করে বেহুঁস অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। অন্ধকারে পেছন থেকে ছুরি মারার মতই না, এ দুশমনি! সব চেয়ে দুঃখ দেবলের, ষড়যন্ত্রটা আগে ও জানতে পারে নি; আর যখন জানতে পারল তখন সে বিছানায়, আয়ার জেলে, লীলাবতী আর চারু ভেগে গেছে।

মনে মনে আরও এক জায়গায় সাজ্যাতিকভাবে জখম হয়েছে দেবল। শক্তি দিয়ে এক নারীকে সে জয় করেছে—এ বিশ্বাস তার জন্মে গিয়েছিল।

জয়ের এ অপরিসীম আনন্দে মশগুল ছিল দেবল; ভেবেছিল, তার এমন এক যোগ্যতা আছে, যা চারু-মন্মথর নেই—আয়ারেরও না। এখানে স্বতন্ত্র সে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সফল। কিন্তু সেই লীলাবতীও তো হাতছাড়া হ'ল, পালিয়ে গেল চারুর সঙ্গে—যার মুরগির মতন পল্‌কা হাড় গায়ের, কবুতরের মতন বুক। তবে? তবে কি ওর এই অসুর-ক্ষমতার কোনো দাম নেই? মেসিন যার কাছে বশ মানে, মানুষ মানে না। কাহে, কিয়া বাস্তে?

মনের একটা বিশ্বাস, স্বপ্ন, প্রত্যয় যখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে—আর মনে মনে ছটফট করছে দেবল তার ব্যর্থতায়, তখন—ঠিক তখনই—দিনের পর দিন—সর্বক্ষণ গৌরীর সান্নিধ্য পাচ্ছে ও। লীলাবতীর চাতুরী আর ছলনায় যখন ও বিরক্ত ব্যাহত বিভ্রান্ত, ঠিক তখনই গৌরীর স্নিগ্ধ রূপ, ক্লান্তিহীন সেবা, নরম মনের মিষ্টি উত্তাপ পেয়ে পেয়ে দেবল যেন এক মেরু ছেড়ে চুম্বকের টানে অন্য মেরুতে চলে আসতে লাগল। এ যেন অনেকটা তেমনি—নদীর এককূল ভেঙে আর এককূল গড়ে ওঠা।

দেখতে দেখতে ফাল্গুন গেল—চৈত্রও যায়-যায়। পাথরচটির শূন্যতা থেকে কুয়াশা মুছে গেছে—বসন্ত বাতাসের তাপ বেড়েছে পাতা ঝরে গেছে শিশু আর দেবদারুর, পলাশবন এখনও লাল।

এমন এক চৈত্রশেষের সন্ধ্যায় বকুল এল দেবলকে দেখতে। এর আগেও এসেছে কয়েকবার। সঙ্গে মন্মথ। গৌরী বসে বসে গল্প করছিল দেবলের সঙ্গে। বকুলকে দেখে, হেসে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল।

'বকুলদি? আসুন—'

গৌরীর পিঠে হাত দিয়ে বকুল বলল, 'আমিই তো আসি। তুমি তো আর যাও না!' তারপর দেবলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন আছে তোমার রুগী?'

'রুগীকেই জিজ্ঞেস করুন।' গৌরী মিষ্টি করে হাসল, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, পা ঝুলিয়ে বসেছে। ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এখানে আর ভাল লাগছে না রুগীর, রাধানাথপুর যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে!'

'তাই নাকি দেবলভাই?' বকুল হেসে প্রশ্ন করল, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে তোমায়?'

'আচ্ছা তো হয়ে গেছি চারু-বহু, দো-দশ দিন আর। ব্যাস, তারপর তো বিলকুল ফিট্!'

গৌরীর কানে বকুলের দেবলভাই ডাকটা বেশ লাগল। এই প্রথম শুনল ও। আর দেবলের ডাক চারু-বউ, তাও বেশ মিষ্টি শোনাল কানে।

গৌরীর সঙ্গে বকুল ভেতরে চলে গেল।

'আমায় এবার নিজের ডেরায় নিয়ে চল, মন্মথ।' দেবল বলল।

'কেন এখানে তোর অসুবিধেটা কি। দিব্যি তো আছিস—!'

'না, না। বহুৎ দিন হয়ে গেল রে!' দেবল বালিশের পাশ থেকে জলিকে তুলে নিল কোলে।

'হোক না, কিসের আটকাচ্ছে তোর। সেখানে তোর কোনো বউ আছে রে, শালা—খোঁড়া পায়ের সেবা করবে?'

'এখানভিতেই বা আমার কোন্ বউ আছে?' দেবল হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে।

'কেন, গৌরী?' মুখ থেকে কথাটা ফস্ ক'রে বেরিয়ে যেতেই মন্মথর মনে হ'ল, সে কি বলতে কি বলে বসল। তাড়াতাড়ি সংশোধন করে বলল, 'এখানে বউ না থাক, গৌরী আছে। এমন সেবা পাবি কোথায়! এমন যত্ন আরাম!'

দেবল চুপ। সারা মুখটা তার হঠাৎ কেমন যেন অদ্ভুত করুণ হয়ে উঠেছে। ঘোলাটে চোখ দুটো আরও ঘোলাটে। জলির নরম লোমে আঙুল জড়িয়ে জড়িয়ে দেবল সেই মোলায়েম স্পর্শটুকু বিন্দু বিন্দু করে হাতে মেখে নিতে লাগল। সারা গা শিরশির করে উঠল ওর।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি দেবল ফিরে গেল তার নিজের বাসায়, রাধানাথপুরে—অ্যাশলে সাহেবের বাঙলোর সেই সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে। পা-টা সেরেই গেছে ওর, হাঁটতে পারে; তবে এখনও একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। আরও সপ্তাহ দুয়েকের ধাক্কা। নিজের হাতেই বসে বসে হরদম মালিশ করে দেবল পায়ে। সাহেব বলেছে, পা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালাতে পারবে না ও; তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা-টাকে একেবারে আগের মতই মজবুত করে নিতে চায় দেবল। এভাবে শুয়ে-বসে আর ভাল লাগে না।

রাধানাথপুরে যাওয়ার হপ্তা তিনেক পরে দেবল সাইকেলে চেপে কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাসায় এসে হাজির। তাই দেখে গৌরীর চোখের

পাতা ফাঁক হয়ে থাকে। বলে, 'কি সর্বনাশ! এতটা পথ এমনি করে তুমি এলে, দেবলভাই?' বকুলের শুনে শুনে গৌরীও তাকে ওই নামে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

দড়ির খাটিয়ায় বসে পড়ে দেবল হাসে। জবাব দেয়, 'এক পায়ে প্যাডেল মারলুম, গৌরী। দো পায়ে ভি পারতুম—। আচ্ছা হয়ে গেছি। কোথাও ভি দরদ নেই। দু-পাঁচ দিনে ফিন সাহেবের গাড়ি চালাব।'

'অত বাহাদুরিতে লাভ কি তোমার?' গৌরী যেন একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'গায়ে জোর আছে তোমার, সকলেই জানে; তা বলে সব জায়গায় সেই জোর ফলাবে?'

গৌরীর কথা শেষ হয় নি, কিশোরী কম্পাউণ্ডার আর বিজন এসে হাজির। দু'জনে যেন কি একটা কথা বলতে বলতে আসছিল। দেবলকে দেখে কিশোরী কম্পাউণ্ডার দু-চার মুহূর্ত শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, আর হাসল।

'সিংহী মশাই যে! এলে কি করে—বাইকে নাকি?'

দেবল মাথা নাড়ল।

'বা—বা!' কিশোরী কম্পাউণ্ডার প্রশংসাসূচক টানা শব্দ করলে, 'ঠিক করেছ। পা তোমার সেরে গেছে। দু-চার দিন চলাফেরা করলে, একটু-আধটু বাইক করলেই সব অল্‌-রাইট হয়ে যাবে। বুঝলে বিজন, আমাদের সময়ও একটু-আধটু হাত-পা ভাঙলে, দু-একটা গুলি পায়ে-হাতে বিঁধলে আমরা কেয়ারই করতুম না। ঢাকা জেল থেকে সুরেশদা যখন পালাল, পাঁচ-পাঁচটা গুলি বিঁধেছিল তার দু'পায়ে। তবু কি ধরা দিল

নাকি ? উহুঁ—অমন পাঁচিল টপ্‌কে পাগলাঘন্টির নাগপাশ কেটেকুটে ঠিক বেরিয়ে গেল।'

কিশোরী কম্পাউণ্ডার দেবলের পাশে দড়ির খাটিয়ায় বসে পড়ল। বিজন থাকল দাঁড়িয়ে।

বিজনকে দেবল এ বাড়িতে আগেও কয়েকবার দেখেছে। দেবলদেরই সমবয়সী। রোগা চেহারা। রঙটা ফর্সাই গায়ের। চোখে চশমা; মাথায় একঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। গায়ে পাঞ্জাবি, আর পরনে পা-জামা। হাতে একটা ঝোলানো ব্যাগ।

'তোমাদের রাজনীতিতে আজকাল শুধু কথার কচ্‌কচি—' কিশোরী কম্পাউণ্ডার বলল, 'দেহে-মনে শক্তিহীন হয়ে কথায় চিঁড়ে ভিজিয়ে কোন্ উপকারটুকু তোমরা দেশের করবে, আমার তা মাথায় ঢোকে না!'

'এ যুগটা রামায়ণ-মহাভারতের নয়, কিশোরীদা—ভীমের গদার কদর আর নেই। এ যুগটা বুদ্ধির যুগ। বুদ্ধির কাছে সব ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। বিশটা জোয়ান মানুষে যা করবে, একটা পুচকে মেসিনে তার পাঁচগুণ কাজ হয়ে যাবে। কি হবে গায়ের শক্তিতে? নিগ্রোদের ছবি দেখেছেন তো—এক-একটা যমদূত যেন—সেই নিগ্রোদেরই কি হাল দেখুন-না। মুষ্টিমেয় ক'টা লোকের বুদ্ধির দাপটের কাছে তারা ভেড়া বনে রয়েছে। ফিজিক্যাল স্ট্রেংথের কোন্ মূল্য থাকল তবে?'

বিজনের কথায় কিশোরী কম্পাউণ্ডার কি কৌতুকের খোরাক পেল, কে জানে—উচ্চকিত হাসিতে সকলকে বিমূঢ় করে দিল।

'হাসছেন যে?' বিজন ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল।

'নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়ে গেছ, ভায়া! তোমার বুদ্ধির উদ্দেশ্য তো কতকগুলো শক্ত-সমর্থ সাদাসিধে ভাল মানুষকে বশ করে ভেড়া করে রাখা? অমন বুদ্ধি—কুবুদ্ধি। তার মূল্য যদি আমায় মানতে হয়, তবে বলব, অমৃতের চেয়ে বিষের গুণ বেশি—মূল্য বেশি।'

'বিষও তো অমৃতের কাজ করে—' বলল গৌরী, 'তোমার কত ওষুধই তো বিষ, কাকা—কিন্তু সেই বিষ দিয়েই না রোগ সারাও তুমি।'

'হ্যাঁ, সারাই বইকি! কিন্তু সবই মাত্রার ওপর নির্ভর করে। একটা মাত্রা আছে বিষের, সেই মাত্রা পর্যন্ত বিষ বিষ হয়েও অমৃত—তার বেশি হ'লেই সর্বনাশ! তেমনি বুদ্ধি যতক্ষণ শুভবুদ্ধি, ততক্ষণ তা মঙ্গলের—তার বেশি হ'লেই তাকে আর বুদ্ধি বলি না—। কুবুদ্ধির অর্থ আলাদা।'

গৌরী চুপ করে গেল, তাকাল বিজনের দিকে। বিজনও চুপ। তবে এমন একটা মুখভঙ্গি করল, যেন নেহাতই অবজ্ঞাবশত এইসব বাজে তর্কে যোগ দিতে সে রাজি নয়।

একটু চুপচাপ থেকে বিজন গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'গৌরী, পেটে কিছু পড়ে নি সারাদিন; ব্যবস্থা করবে নাকি কিছু? খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু। আমি এখুনি আবার চলে যাব।'

'এলেন কেন তবে?' গৌরী যেন অখুশি হয়ে জবাব দিল।

'এলাম গরজে। কাজ ছাড়া কি আসি নাকি আমরা?' বিজন বেশ সহজ গলায় বলল, 'সময় কই, বলো?'

গৌরী দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে অদৃশ্য হ'ল।

খাটের একপাশে বসে বিজন অন্য কথা সুরু করল। বলল, 'আমি যার জন্যে এলাম, তার কি হবে, কিশোরীদা?'

'কি? ভোট?'

'হ্যাঁ, ভোট।'

'আমি কি করব, বলো? আমার কথায় যারা আস্থা রেখে ভোট দেবে, তাদের ভোট তো তোমরা পাবে না।'

'কেন পাব না, সে কথাটাই তো শুনতে চাই! আমাদের যিনি ক্যাণ্ডিডেট, তিনি একজন নাম-করা নেতা। তা ছাড়া এমনিতেও পণ্ডিত লোক। তাঁর চেয়ে যোগ্য লোক আর কে আছে?' বিজন যেন চ্যালেঞ্জ জানাল।

'আমাদের এ পাশের কোলিয়ারীর একটা লোকও তোমার পণ্ডিত নেতাটির নাম জানে না, ভায়া। জন্মেও কোনদিন চোখে দেখে নি তাঁকে। ওসব সর্বহারা ভুখ-মিছিলের ঝক্‌মকে কথা, প্রসেশান আর শ্লোগান এরা বোঝে না, বুঝতে চায় না। তোমায় বৃথা আশ্বাস দিয়ে আমার কি লাভ! নিজে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার—আমি তোমার হয়ে ভোট কুড়িয়ে দিতে পারব না।' কিশোরী কম্পাউণ্ডার খাট ছেড়ে উঠে পড়ল। দেবলকে বলল, 'উঠে দাঁড়াও তো সিংহীশাবক, সোজা হয়ে হাঁট—দেখি তোমার পায়ের অবস্থাটা।'

দেবল উঠে দাঁড়াল; বিজনও। বিজন গিয়ে ঢুকল ঘরে।

সপ্তাহ তিনেকও পুরো লাগল না—দেবল দিব্যি হেঁটে-ফিরে বেড়াতে সুরু করল আবার। আগের মতই সাদা উর্দি গায়ে অ্যাশলে সাহেবের গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরতে লাগল এ-কোলিয়ারী থেকে সে-কোলিয়ারী—আসানসোল, বরাকর, ধানবাদ। পুরনো জীবনটা ফিরে পেল দেবল।

অনেক দিন পরে ভাটিখানার সেই পুরনো আড্ডায় বাতি জ্বলে উঠল; মুখোমুখি বসল এবার মন্মথ আর দেবল। দুই বন্ধুর গলা-জড়াজড়ি, অট্টহাসি আর শ্লীল-অশ্লীল চীৎকারে ভাটিখানার মরা ঘর জেগে উঠল নতুন করে।

নেশায় চুর হয়ে মন্মথ বলে, 'চারু গেছে—ঝুট্ ঝামেলা কেটে গেছে। আর কোনো বেটাকে আনছি না এখানে—সেরেফ তুই আর আমি, দেবলা। খবরদার শালা, কাউকে আনবি না। কাছে ঘেঁষতে দিবি না। বেইমান শালা—এ দুনিয়াটাই বেইমান!'

'ঠিক বাত।' দেবল মাথা নাড়ে ঘোর নেশায়, 'বেইমান—দুনিয়াই বেইমান।'

একদিন মন্মথ বলল, 'জানিস দেবলা, চারু-বউয়ের বাচ্চা হবে।'

'বাচ্চা?' দেবল যেন নতুন কথা শুনল।

'হ্যাঁরে—' বলল মন্মথ, 'মহা ঝামেলায় ফেলেছে, মাইরি। চারু শালা তো কোথা কেটে পড়েছে, এখন কি করি বল্ তো? চারু-বউকে রাখি কোথায়?'

'তোর কাছে রাখ্—এ্যতনা ঘর আছে।'

'না, না, এখানে নয়! আমি আইবুড়ো একা লোক! ভাবছি, গাঁয়ের গোলক আঘোরীর বাড়িতে একটা ব্যবস্থা করে দি।'

'তাই দে।' দেবল সম্মতি জানাল। আর হঠাৎ চারুর ওপর, কে জানে কেন, অসহ্য রাগ হ'ল দেবলের। বিড়বিড় করে বললে, 'শালা, কুত্তার বাচ্চা! টুঁটি নিয়ে নেব, আগর কোই দিন দেখি যদি।'

'আলবৎ নেবো।' মাতাল মন্মথ মাথা ঝাঁকিয়ে হাত ঠুকে বলল।

পরের দিনই দেবল গেল বকুলকে দেখতে। বকুল অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'কি দেবলভাই, কেমন আছ?'

'আচ্ছা। তোমার তবিয়ৎ কেমন আছে চারু-বহু?'

'ভাল।'

দেবল বিশ্বাস করল না। চারু-বউয়ের শরীরটা ভীষণ ভেঙে পড়েছে। সে মুখচোখ, হাসি আর নেই। দেবল তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দেখল বকুলকে। আসার সময় বলল, 'মন্মথ তোমায় গোলক আঘোরীর বাসায় রাখবে বলেছিল, চারু-বহু। যাবে তুমি?'

'না গিয়ে উপায় কি? যেখানে জায়গা পাই, সেখানেই যেতে হবে।' মৃদুস্বরে জবাব দিল বকুল।

'ঘর ফিরে যাও না!'

'ঘর?'

'হাঁ, কলকাত্তা।'

বকুল দেবলের মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল।

হতচকিত হয়ে দেবল বসে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'রোও কেন, চারু-বহু? ও শালা কেতনা দিন থাকবে বাহার! জরুর ফিরে আসবে। এখানে তোমার কুছ তক্‌লিফ হবে না। আমরা আছি।'

আস্তে আস্তে বাইরে এসে সাইকেলটা উঠিয়ে নিল দেবল। হাঁটতে শুরু করলে অন্যমনস্কভাবে।

খেয়াল হ'ল তখন, যখন কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ও। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে, সদর দরজা খুলে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে, বিজন দু' পা মাত্র দূরে।

দেবলকে দেখে বিজন দাঁড়িয়ে পড়ে গৌরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এই দালালটাকে বড় আস্কারা দিচ্ছ তোমরা—বিশেষ করে তোমার কাকা। শেষ পর্যন্ত সব না ভেস্তে দেয়।'

'দালাল হবে কেন?' গৌরী প্রতিবাদ করলে।

'দালাল ছাড়া কি?' বিরক্ত মুখে জবাব দিল বিজন, 'অ্যাশলে সাহেবের বডিগার্ড। ওর হিস্ট্রি তুমি জান? অ্যাশলেকে একবার ঘেরাও করেছিল লেবাররা—ওই স্কাউণ্ড্রেলটাই সাহেবকে বাঁচিয়েছে কটা লেবারকে মারাত্মক জখম ক'রে। তারপরই না বেটার সাদা উর্দি!'

দেবল এসে পড়তে বিজন থামল। তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে একটা উগ্র দৃষ্টি হেনে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেল।

সাইকেলটা রেখে দেবল দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

খানিক পরে ভেতর দালানে বসে দেবল গৌরীর দেওয়া চা আর মুড়ি খেতে খেতে গল্প করছিল। কি কথায় যেন কথা উঠল বিজনের।

'বিজনবাবু কাঁহা থাকে, গৌরী?'

হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ হ'ল গৌরীর। একেবারেই অকারণে। আগে কখনো হয় নি। বিজনের কথাগুলোই মনে পড়ল ওর। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা তো জানি না ঠিক।'

'আজব বাত। ইতনা যাওয়া-আসা—তুমি ওর পাত্তা জান না?'

গৌরী মাথা নাড়াল। হেসে বললে, 'ওর বাড়ি কি একটা, দেবলভাই! সব জায়গাতেই ওর আস্তানা। বছরে চার মাস তো জেলেই কাটে।'

'জেল?'

'হ্যাঁ, জেল—কয়েদখানা।' গৌরী গর্বের স্বরে বলে।

'ক্যায়সা বাত? জেলমে তো কয়েদী, চোর থাকে?'

দেবলের অজ্ঞতায় গৌরী ক্ষুণ্ণ হয়। লাল হয়ে ওঠে ওর মুখ। বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'তুমি চোর ডাকাতের জেলখানা চেনো, তার বেশি জানো না। আমার কাকা জেল খেটেছে ছ' বছর। বিজনবাবুও জেল খাটে। এরা চুরির জন্যে জেলে যায় না। আপন দেশ, ভাই-বোনের জন্যে জেলে যায়, কষ্ট সয় হাসিমুখে।'

দেবল ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে যায়। বুঝতে পারে অন্যায় কোনো কথা

বলে ফেলেছে। খানিক পরে অনুতপ্ত হয়ে বলে, 'আমি জানি না গৌরি! মাফ্ করো। কি কাম করে বিজনবাবু?'.

বিজন কি কাজ করে, সেটা বলতে অবশ্য কোনো বাধা দেখল না গৌরী। বরং বিজন যে কত বড় মানুষ, কি অসাধারণ তার ক্ষমতা, গৌরী তা বলতে পেরে খুশী হয়ে উঠল।

গৌরী বলছিল বিজনের কথা। সে যেন এক থিয়েটার-সিনেমার কাহিনী। দেবল অবাক হয়ে শুনছিল সে কাহিনী—চোখের ওপর তার ভাসছিল রোগা-সোগা ওই ফর্সা ছেলেটির মুখ। ···দেশের কাজ করে বিজন। কোথায় ওর বাড়ি-ঘর কেউ জানে না। অনেক লেখাপড়া জানে বিজন, দু-শ' পাঁচ-শ' লোকের সামনে বক্তৃতা দিতে পারে। সাহেবদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলে। হাজার হাজার মজুর, গরিবের থাকার-খাওয়ার, সুখ-সুবিধের জন্যে লড়াই করে ও। তারা ওকে ভীষণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। জেল খেটেছে দেশের জন্যে। প্রাণপাত করছে গরিবদের ভালোর জন্যে। বিজনরা বলে, গরিব মজদুররাই এ সবের মালিক—এই কারখানা, কোলিয়ারী, মেসিন। ওরা রাজত্ব পেলে দেশের হাল বদলে যাবে। গরিব-দুঃখী বলতে কেউ থাকবে না আর। সবাই খেয়ে-পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবে। ওই শয়তান ইংরেজরা তখন আর এ দেশে থাকবে না।

'কাহে?' দেবল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'কেন কি, ওরা যে বিদেশী! অন্য দেশ থেকে এদেশে এসে আমাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে।' গৌরী দেবলের অজ্ঞতা ঘোচাবার চেষ্টা করে।

'ওরা যে রাজা !'

'কিসের রাজা ? বেনের জাত, ঠগ, বদমাশ। ঠকিয়ে এ দেশের রাজা হ'ল।'

'কোন্ দেশের লোক ওরা, গৌরী ? বিলাইত্ না—?'

'হ্যাঁ, বিলেতের।'

বিলেত দেশটা যে কোথায়, কতদূর, কেমন দেশ—দেবল যেন মনে মনে তা কল্পনা করবার চেষ্টা করে।

দেবলের অজ্ঞতা নাশ করতে গৌরী যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, যথার্থ-পাত্র বলতে হবে। গৌরীর জ্ঞানবুদ্ধি যতটুকু, ততটুকুতেই দেবলের মত লোককে বোঝানো যায়—তার বেশি হ'লেই মুশ্কিল।

দেবল সিং-এর চোখের সামনে হঠাৎ যেন এক নতুন ঘরের দরজা খুলে যায়। অদ্ভুত এক নেশায় টানে ওকে এই দিশী কাহিনীর যাদু। গৌরীও যোগ্য ছাত্র পেয়ে নিজে কৃতার্থ হ'ল। সে বেচারীরও তো কথা বলতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু শুনবে কে। বিজন তো অনেক বড়, গৌরী তার নখযোগ্য নয়। কিশোরী কম্পাউণ্ডারের কাছেও গৌরী কোন্ কথাটা বলবে ? দেবলই ঠিক মানুষ।

ভাটিখানার ঘরে প্রায়ই আজকাল দেবল অনুপস্থিত।

'কি রে শালা, তোর আবার হ'ল কি ? যাস কোথায় সাঁঝে ?' মন্মথ জিজ্ঞেস করে।

'কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাসায়।'

'কেন, রোজ ওখানে তোর আছে কি—?'

'বাতচিত শুনি।'

'কিসের বাতচিত?'

'আমার দেশ-ঘরের—হিন্দুস্থানের—' দেবল ছোট্ট ছোট্ট করে বলে; গলার স্বর মোটা।

'এ্যাঁ, বলিস কি?' মন্মথ আকাশ থেকে পড়ে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দেবলের মুখের দিকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'কিশোরী কম্পাউণ্ডার কিন্তু গাঁধীর চেলা, দেবলা। সাবধান শালা, ওর পাল্লায় পড়লে কিন্তু রসগোল্লা বনে যাবি।'

'কিশোরী কম্পাউণ্ডারের সাথে তো বাতচিত হয় না।'

'তবে?'

'গৌরীর সাথ হয়।'

'গৌরী? গৌরী তো মেয়েমানুষ রে, সে কি জানে এ সবের?'

দেবল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'জানে রে, বহুত জানে—তোর আমার চেয়েভি বেশি।'

*

* *

হু হু করে দিন কেটে যায়। গরম শেষ হয়ে বর্ষা নেমেছিল। এবার সেই বর্ষারও যাবার পালা। আশ্বিনের নীল আকাশে তুলো-মেঘ ভেসে বেড়ায়, মিষ্টি রোদ্দুর পাথরচটির পথঘাট ভিজিয়ে রাখে, সবুজ হয়ে থাকে কোলিয়ারীর আশেপাশের ক্ষেতগুলো—কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পহীন শাখার ডালে সারা দুপুর ঘুঘু ডাকে।

দেবল আর মন্মথর দিনগুলো ভালই কাটছিল। বিশেষ করে দেবলের। মন্মথর বন্ধুত্ব ছাড়া দেবল আর একটা নতুন স্বাদ পেয়েছে। জীবনের সেই স্বাদে গন্ধে ওর শিশুমন রমণীয় হয়ে থাকে। আজকাল মাঝে মাঝে পাথরচটিকে কেমন যেন নতুন বলে মনে হয় দেবলের, ভাল লাগে—ভীষণ ভাল লাগে—। সম্ভবত কয়লাকুঠির সমস্ত কালো কেউ যদি মুছে সোনা ছড়িয়ে দিয়ে যায়, পলাশবনের বসন্তকে আর পাঁচ ঋতুর মধ্যে মাখিয়ে রাখে—তা হ'লেই এমন মধুর লাগতে পারে আকাশ, বাতাস, সময়, মন, মানুষ।

দেবলের এ পরিবর্তন এত স্পষ্ট যে, মন্মথর চোখেও ধরা পড়ে গেল সব।

মন্মথ বলে, 'কি রে দেবলা, আবার গাড্ডায় পড়লি ?'

'কিসের গাড্ডা ?'

'ন্যাকা-চৈতন সাজছিস ? বুঝিস না—?' মন্মথ ওর দিকে তাকিয়ে মুখচোখ কুঁচকে হাসে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, 'কাজটা কিন্তু ভাল করলি না, দেবলা! হাজার হোক, গৌরীতে আর তোতে অনেক তফাত।'

তফাতটা যে দেবল না বোঝে, তা নয়। তবু গৌরীকে দেখে, তার

কাছে থেকে, তার কথা শুনে যে আনন্দ, তেমন আনন্দ আর কিছুতে পায় না দেবল। জলির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সারাদিন আজকাল গৌরীর কথাই ভাবে ও।

কিছুদিন ধরে ভোটাভুটির ব্যাপার নিয়ে পাথরচটি কোলিয়ারী খুব সরগরম হয়ে উঠেছে। হাটের মাঠে প্রায় রোজই আজকাল মিটিং বসে। এ-দল ও-দলের লোক আসে, হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দেয়, রঙ-বেরঙের কাগজ গুঁজে দেয় হাতে। বিজনকে রোজই প্রায় দেখা যায় সেই লোকের ভিড়ে। বিজনের সঙ্গে আরও কিছু লোক।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে ভাটিখানার দিকেই যাচ্ছিল দেবল, হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সাইকেলটার মুখ ঘুরিয়ে দিলে কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাড়ির দিকে।

কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাসায় পৌছে দেবল দেখে, বাড়িটা ফাঁকা—বাইরে কেউ নেই। অথচ দরজা খোলা। আনমনেই দেবল দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দালান দিয়ে ক' পা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে—গৌরীর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিজন আর গৌরী। চায়ের প্যাকিং কেসের একটা বাক্সর ওপর ঝুঁকে পড়ে বিজন কি যেন সব রাখছে সন্তর্পণে—গৌরী নিষ্পলক নয়নে দেখছে তা।

দু' চার মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে দেবল কে জানে কেন কয়েক পা পিছু ফিরে এসে ডাকে, 'গৌরী—'

চমকে উঠে মুখ ফেরায় গৌরী। দেবলকে দেখতে পায় না।

ঘরের বাইরে এসে গৌরী বলে, 'কে দেবলভাই? কখন এলে?', গৌরী বিবর্ণ মুখে সদরের দিকে তাকায়।

খানিক পরে বিজন গৌরীকে একটু আড়ালে নিয়ে কি বললে যেন। গৌরী ফিরে এল দেবলের কাছে।

'বড় সময়ে এসে পড়েছ, দেবলভাই! একটা কাজ করে দেবে?'

'কি কাজ?' দেবল চোখ তুলে জানতে চায়।

'বিজনবাবুরা একটা গাড়ি যোগাড় করেছে কোনরকমে। চালাবার লোক নেই। তুমি ওদের গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবে?'

'কাঁহা?'

'ফুলবাগান, হরিতোড়, ছষ্টিপুর—এইসব জায়গায় যাবে বাবুরা ভোটের জন্যে। আজ সারা রাত ঘুরবে। আর তো সপ্তাহ খানেকও নেই ভোটের।' বলল গৌরী মুখে কাজের ব্যস্ততা ফুটিয়ে।

'এই কাম?' অবহেলায় হাসল দেবল, 'ঠিক হ্যায়, গাড়ি কাঁহা?'

'গাড়ি ঠিক আছে।' এগিয়ে এসে বলল বিজন, 'গিয়ে আনতে হবে। আমি চিঠি দিচ্ছি। স্টেশনের কাছে এক বাবু গাড়ি নিয়ে বসে আছে।'

বিজনের চিঠি নিয়ে দেবল চলে গেল।

ফুলবাগান, হরিতোড় সবই চেনা-জানা দেবলের। গাড়িটা একেবারে ঝরঝরে। তবু কোলিয়ারীর সেই এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা পথে গাড়ি চালিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াল দেবল। সঙ্গে বিজনবাবুরা তিন-চার জন।

ছত্তিপুরে গিয়ে গাড়ি বিগড়োল। মেরামতি করতে সময় লাগল খানিকটা। গাড়ি মেরামতি শেষ করে দেবল গেল বিজনদের ডাকতে।

মদন পঙ্খীরাজের বাইরের দালানে বেশ ভিড়। বিজনবাবুরা সেই ভিড়ের মধ্যে গোল হয়ে বসে। সামনে মদন পঙ্খীরাজ ও তার দলবল। কলাপাতা, লুচি, মাংসের হাঁড়ি আর খেনো মদের বোতল খোলা। দেখলে মনে হয় কিসের যেন একটা ভোজ বসেছে। দেবল গিয়ে এক পাশে দাঁড়াল।

মদন পঙ্খীরাজ প্রায় হাত জোড় করে গলা ঝুঁকিয়ে বসে আছে বিজনের সামনে। এদিক ওদিক প্রায় সকলের হাতেই কাগজ আর সেই কলসী, ছাতা, তালা আঁকা টিকিটগুলো।

মদন পঙ্খীরাজ বলছিল, 'তা হ'লে তোমরা সবে ই বাবুর কাছ থেকেই জেনে লাও কাকে ভোট দিবে? আমার ঠেঙে কেউ কিছু জানতে চেও নি। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ভালমন্দ অত কি বুঝি? কি বলেন কেনে বিজন বাবু, ঠিক কি না—?'

বিজন মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ—। ভোটেই তো সব। খুব বুঝে সুঝে ভোট দিতে হবে আপনাদের। এই ভোটেই কাপড় জুটবে, পেট ভরাবার চাল আসবে, মাথার ওপরকার বাড়ি হবে আপনাদের। আমি যাঁর নাম বলছি—ননীমাধব চৌধুরী, তাঁকেই ভোট দেবেন আপনারা, নাম হয়তো মনে থাকবে না সকলের—চিহ্নটা মনে রাখবেন—এই তালা —তালা।'

'ননীমাধব যাদব চিনি না—তালা-ফালাও বুঝি না—' কে একজন

বলল, 'ভোট দিব নাই কেনে—দিব, আমাদের জানা গাঁধীর লোককেই দিব বাপু।'

'তালা কোন্ দলের?' আর একজন কে বলল।

'আপনাদের জানা-শোনা কোনো দলের লোকেরই—' বলল বিজন, 'দেখুন না—। কুমুদ দাও তো কাগজ—কিছু দাও তো ওঁদের।'

গাড়িতে ফিরে আসার সময় মদন পঙ্খীরাজ বললে, 'তা আমার-টা হোক্ ইবার বিজন বাবু—কি বলেন—' শকুনির ছানার কান্নার মত টেনে টেনে অদ্ভুত শব্দ করে হাসল লোকটা।

বিজন, মদন পঙ্খীরাজের হাতে কি যেন গুঁজে দিল; নীচু গলায় বলল, 'তালার বাক্সে ভোট যদি না পড়ে পঙ্খীরাজ, পরিণামটা খারাপ হবে। তোমার তেজারতির গদি আর লোহার সিন্দুক বোমা মেরে উড়িয়ে দেব তা হ'লে! সাবধান!'

'পড়বেক গো পড়বেক, বিজনবাবু। এরা অতশত বোঝে না। কিন্তুক কায়দাটো জোর করলেন, তালা কি আর গাঁধীর দলের—' শকুনির ছানার কান্নার মত সেই বিশ্রী হাসি, 'বলিহারী মাথা আপনাদের—গাই তো গাই, বলদ তো বলদ। যেখানে যেমন—'

'চুপ।' বিজন যেন ধমক দিয়ে ওঠে।

ফেরার পথে গাড়ি চালাতে চালাতে সারা পথ দেবল কথাটা ভাবল। ও তো দেখেছে, দেখছে রোজই ওদের কোলিয়ারীতে এই ভোটাভুটির

হৈ-হট্টগোল। তালা চিহ্নটা বিজনবাবুদের দলের দেবল তা জানে, গাঁধীর দলের তো নয়। তবে বিজনবাবু ওদের কাছে অমন মিথ্যে কথা বললে কেন?

ভেবেছিল কথাটা কোন সময়ে জেনে নেবে গৌরীর কাছ্ থেকে। কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটল না দেবলের।

হাটবারের দিন চারপাশ থেকেই লোকজন জড় হয় হাটে—ভিড়ে গিজ গিজ করে ভাটিখানার মাঠ হাট। এবারের হাটবারের দিনেই হাটের মাঠে মিটিং বসল ভোটবালাদের। তিন দলের হৈ হৈ। একটা দল প্রথম চোটেই পালাল। বাকি দুই দলে কথা কাটাকাটি শুরু করল। সেই কথা কাটাকাটি শেষ পর্যন্ত মাথা ফাটাফাটিতে গিয়ে দাঁড়াল। দুই দলে মারপিট। লাঠি চলে এল ঝপাঝপ্; ইট, পাথর, কয়লার চাঁই। শেষটায় কোথা থেকে কে বন্দুক দাগল।

না, বন্দুক নয়, প্রথমটায় মনে হয়েছিল বন্দুকই—শেষে জানা গেল, বন্দুক নয়, বোমা। নিমেষে হাট ফাঁকা, তল্পিতল্পা গুটিয়ে ব্যাপারীরা পর্যন্ত উধাও।

রাধানাথপুরে বসে দেবল গণ্ডগোলের খবরটা পায় নি। বিকেল শেষে সাইকেল চালিয়ে রোজকার মত ভাটিখানার আড্ডায় আসতেই মন্মথর কাছে সব শুনল।

'কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাসায় পুলিস এসেছে, দেখলি নাকি?' প্রশ্ন করল মন্মথ।

'কই না! খেয়াল করলাম না। সাচ্ নাকি রে?'

'হ্যা, তাই তো বলছে সবাই।'

'কেন রে?'

'কে জানে!' মন্মথ তার অজ্ঞতা জানাল, 'কম্পাউণ্ডারের বাড়িতে নাকি বোমা, বন্দুক লুকনো আছে।'

দেবল হঠাৎ যেন চমকে উঠল। মন্মথর দিকে বোকার মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে পড়ল ও।

'চললি কোথায়?' জানতে চায় মন্মথ।

'কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাড়ি।'

মন্মথ কিছু বলার আগেই দেবল ঘর ছেড়ে বাইরে পা দিয়েছে। সাইকেলটা টেনে নিয়েই জোর প্যাডেলে এগিয়ে চলল ও। হঠাৎ কেমন যেন একটা উত্তেজনা এসেছে তার—অনেকদিন পরে। মাথার মধ্যে স্পার্ক মারছে আবার। সন্ধ্যের অন্ধকার আর হাওয়া কেটে সোঁ সোঁ এগিয়ে যাচ্ছে সাইকেলটা।

কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাসায় এসে সাইকেল থেকে নামল দেবল। বৈঠকখানা ঘরে পুলিসের দারোগা আর আশেপাশেও দু-চারটে কনেস্টবল দাঁড়িয়ে আছে।

দেবলকে বাধা দিল একজন। লাঠি সরিয়ে দিয়ে দেবল কি বললে যেন, তারপর সটান গিয়ে ঢুকল বৈঠকখানা ঘরে।

দারোগা নন্দনবাবু চেয়ারে বসে রয়েছেন। ভিতর-দরজার চৌকাঠে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গৌরী। বাতি জ্বলছে। সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ। থমথমে আবহাওয়া।

দেবলকে চিনতেন নন্দন দারোগা। বহুবার দেখেছেন ওকে, এমন কি শেষবার সার্কাসে আগুন লাগার দিনেও। ওকে দেখে নন্দন দারোগা চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন তীক্ষ্ণভাবে।

'তুমিই না দেবল সিং?'

মাথা নাড়ল দেবল। হ্যাঁ, ও-ই দেবল সিং।

'ভাল হয়ে গেছ দেখছি—' নন্দন দারোগা দেবলের আপাদমস্তক ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন, 'কিশোরীবাবু কোথায় হে, দেখেছ নাকি?'

'না।' মাথা নাড়ল দেবল। তাকাল গৌরীর দিকে।

নন্দন দারোগা ঘুঘু লোক। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পঞ্চাশ প্রশ্ন আর জেরা শুরু করলেন দেবলকে। 'গৌরী বলছে, কিশোরী কম্পাউণ্ডার আসানসোলে গেছে। সত্যিই গেছে নাকি হে দেবল সিং? দেখেছ তুমি? দেখ নি? কবে দেখেছ তাকে? কোথায়? তুমি কেন আস এখানে? আর কে কে আসে? বিকেলে কোথায় ছিলে, হাটে নাকি? মারপিট দেখেছ? কে ছুঁড়েছে বোমা?'

নন্দন দারোগার জেরায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল দেবল। গৌরীও রেহাই পাচ্ছিল না। রেহাই দেবার ইচ্ছেও ছিল না নন্দন দারোগার। থানায় বসে বসে চোখ কান একেবারেই কি বন্ধ রেখেছেন তিনি? একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড পলিটিক্যাল নেটওয়ার্ক যে এ অঞ্চলে বেশ কিছুদিন ধরে ছড়ানো হচ্ছে নন্দন দারোগা তা জানেন। দু-পাঁচ জনের নামও তাঁর জানা আছে। অ্যাশলে কিংহাম কোম্পানীর কাছ থেকে এ বাবদে মোটা

বকশিশ আদায় করে নেন নন্দন দারোগা পাকে প্রকারান্তরে। অ্যাশলে সাহেব নিজেও কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছেন নন্দন দারোগাকে। বলেছেন, 'বাইরের লোকজন এসে উৎপাত করছে, নন্দনবাবু। লেবারদের মধ্যে ট্রাবল ক্রিয়েট করছে। এ্যণ্ড ইউ আর সিটিং ব্লাইণ্ড!'

না, ব্লাইণ্ড নয়। নন্দন দারোগা অন্ধ হয়ে সত্যিই বসে নেই। চোখ খুলেই রেখেছিলেন তিনি—বিজনের গতিবিধি, তার দলের কীর্তি সবই জানেন তিনি, কিন্তু জেনেও জালের ফাঁস পাচ্ছিলেন না। এবার পেয়েছেন।

জেরার চোটে, দেবলের গাড়ি নিয়ে ফুলবাগান ছষ্টিপুর ভ্রমণের কাহিনীটা প্রকাশ পেল, প্রকাশ পেল বিজন-কুমুদের কথা। দেবল বলেনি; গৌরীই কেমন যেন গোলমেলে কথার জটে পড়ে বলে ফেলল।

আর দুর্ভাগ্য গৌরীর—ঠিক সেই সময়ই অযোধ্যা জমাদার তল্লাশি করে একরাশ কাগজপত্র আর চায়ের প্যাকিং কেসে লুকিয়ে রাখা ক'টা হাতবোমা সমেত বাক্সটা নন্দন দারোগার সামনে এনে রাখল।

গৌরীর মুখটা হঠাৎ ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও দরজার কপাট ধরে। সে দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে দেবল চিনতে পারল বাক্সটা—এই বাক্সটার মধ্যেই বিজনবাবু কি যেন রাখছিল; গৌরী দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। তবে সে দিন বোমাই রাখছিল বিজনবাবু?

কেমন একটা পাশবিক উল্লাসে নন্দন দারোগার দুই চোখ কপালে উঠল, চক্ চক্ করে উঠল সারা মুখ খুশীতে।

'বা, বা—এ যে দেখি না-চাইতেই একরাশ। বা, বা—বেশ বেশ।'

নন্দন দারোগা ভুরু কুঁচকে গৌরীর দিকে তাকালেন একবার—তারপর চোখ ফিরিয়ে দেবলের দিকে, 'কোথা থেকে এল এ সমস্ত—? কে রেখেছে?—'

দেবল ঠোঁট বুজে গৌরীর দিকে তাকিয়ে ছিল। গৌরীও তার দিকে চেয়ে। সে চোখে কি ছিল—কি ভাষা, কার কথা, কোন্ অজ্ঞাত মিনতি—কে জানে? কে জানে দেবল কি বুঝল; কি বুঝতে পারল!

নন্দন দারোগার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেবল প্রথমটায় শুধু ঠোঁট নাড়ল, তারপর বলল, 'ও সব আমি এনেছি দারোগাবাবু।'

'কেন?' নন্দন দারোগার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, দুই চোখ যেন আগুন-জ্বলা।

কেন—? কি উত্তর দেবে দেবল? কিছু যে তার মুখে আসছে না, কিছুই জানে না যে! গৌরীর দিকে আবার তাকিয়ে দেবল কি যেন মনে করবার, ভাববার চেষ্টা করলে। শেষে কোনো রকমে বললে, 'গরিবদের রাজ বয়ঠাবো ওহিবাস্তে।—'

দেবল তার কথাটা শেষ করতে পারল না; নন্দন দারোগা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। দেবল পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। একটা আকাশে-ওড়া-পাখি যেন তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে এসে পড়েছে।

হাসি থামলে নন্দন দারোগা বললেন, 'জমাদার, পাকড়ো উসকো! এ সব উঠাও। থানা—'

দেবল তখনও গৌরীর দিকে তাকিয়ে—গৌরী দেবলের।

*

* *

খবরটা রাত্রেই অ্যাশলে সাহেবের কানে গেল। কিশোরী কম্পাউণ্ডারও ফিরে এসে শুনল সব। শুনেই ছুটল সাহেবের বাঙলোয়।

অ্যাশলে সাহেব বিমূঢ় হয়ে বসে ছিলেন। সমস্ত ঘটনাটাই তাঁর কাছে কল্পনাতীত। কিশোরী এলে তার কাছে একে একে শুনলেন সব। কিশোরী বললে, 'তুমি জান সাহেব, নন্-ভায়োলেন্স আমার ক্রীড্। তা ছাড়া এ কোলিয়ারীর কারুর হয়ে লড়াই করতে হ'লে আমি চোরের মত আসি না—মানুষের মতন আসি। বোমা ছুঁড়ে লোক ক্ষ্যাপানোর বয়স আমার নেই, সে মোহও নেই।'

কিশোরী কম্পাউণ্ডারের কথা অবিশ্বাস করার মত কোনো কারণ ছিল না অ্যাশলে সাহেবের। কিশোরীকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন, আর চেনেন দেবলকেও।

পাইপের তামাকটা ঝেড়ে অ্যাশলে সাহেব উঠে দাঁড়ালেন চিন্তিতভাবে। আজ বাইশ বছর পাথরচটির মাটি খুঁড়ে অ্যাশলে গ্রীন যে-বৈভব উদ্ধার করছেন তার হিসেবটা আছে কিংহাম কোম্পানির খাতায়। কিন্তু তাঁর মনে —নটিংশায়ার কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, তার বদলে এই পাথরচটি তিল তিল করে যে প্রাণিজ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সে কথা কেউ জানে না।

'কিশোরী, গো এণ্ড টেক্ ইওর সিট ইন্ দি কার—আই এ্যম কামিং সুন। লেট্ আস গো টু এস-ডি-ও'স্ বাঙলো।'

অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অ্যাশলে সাহেব দোষ-মুক্ত করলেন দেবলকে। বিজনদের দলের কীর্তি ততদিনে নানাসূত্রে ধরা পড়ে গেছে। কিশোরী কম্পাউণ্ডারও সমানে সাহেবের সঙ্গে ছিল। প্রায় দিন দশেক লেগে গেল গণ্ডগোলটা মেটাতে।

আসানসোল কোর্ট থেকে দেবল যেদিন খালাস পেল, সেদিন অবশ্য সাহেব আসেন নি, কিশোরী কম্পাউণ্ডারও নয়, শুধু উকীল ছিল সাহেবের।

খালাস পেয়ে দেবল প্রথমেই সটান গেল তার রাধানাথপুরের ডেরায়। অ্যাশলে সাহেবের সেই সারভেন্টস্ কোয়ার্টারস্-এ। সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল গেটের সামনেই। দেবলকে দেখে আঙুল নেড়ে কাছে ডাকলেন অ্যাশলে সাহেব। কাছে এলে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ এক ধমক দিলেন তিনি, 'ইউ আর এ গোট্! পাঁঠ্‌ঠা হ্যায় তুম। জানতা হ্যায়? তোমকা মাফিক বুদ্ধু আদমি হাম কভ্‌ভি দেখা নেহি।'

সাহেব হাঁকিয়ে দিলেন, দেবলও আস্তে আস্তে বাগানের পথ ধরে তার ডেরায় ফিরে এল। দরজা খুলতেই জলি কোন্ কোণ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পায়ে। খপ করে তুলে নিল তাকে দেবল। তারপর সটান খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে বুকের ওপর জলিকে ছেড়ে দিল।

টানা একটা ঘুম দিয়ে উঠল দেবল। সূর্য তখন ডুবে গেছে। বাইরে গিয়ে স্নান করল ভাল করে। ঘরে এসে ধোপ-ভাঙা পাজামা, জামা গায় দিলে। চুলটা ঠিক করলে। খিদে পেয়েছিল খুব। হাতড়ে খুঁজে

পেটে দিলে কিছু ; জলিকে খাওয়াল। তারপর বেরিয়ে পড়ল পথে ; জলিকে পকেটে পুরে।

শীতের ঈষৎ একটু আমেজ এই শরৎসন্ধ্যায়। একটু কুয়াশাও জমেছে খাদের মুখে, পলাশবনের মাথায় ধোঁয়াও হতে পারে। আকাশে চকচকে চাঁদ, কোলিয়ারীর কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তাও চাঁদের আলোয় ধোঁয়া।

আনমনে পথ হেঁটে চলেছে দেবল। যাবে ও কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাড়ি। গৌরীকে দেখতে? হ্যাঁ—তাই।

গৌরীকে দেখবার জন্যে বুকটা কেমন যেন করছে দেবলের। সেদিন নন্দন দারোগার সামনে দাঁড়িয়ে গৌরী তার দিকে যতবার চেয়েছে—ততবারের সেই চাওয়ার স্মৃতি ওর চোখের পাতায় অটুট হয়ে আছে। নিমেষের জন্যেও ভুলতে পারে নি। হয়ত ভুলতে চায়ও নি। আজ ক'দিন দেবল তাই দেখেছে, তাই ভেবেছে।

চাঁদের আলো বুঝি জলিরও ভাল লাগছে। পকেটের মধ্যে দেহ ডুবিয়ে রেখে শুধু গলা বাড়িয়ে থাকবে না ও। ভীষণ কেঁউ কেঁউ করছে। দেবল ওকে পকেট থেকে বের করে হাতের ওপর রাখল। জলি চুপ। খুব খুশী।

হাঁটতে হাঁটতে দেবল ভাবছিল, গৌরী তাকে দেখে কি ভাববে? অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়। খুব কি খুশী হবে, গৌরী? আলবৎ হবে। আজ কি আর ও সেই পুরনো দেবল আছে? ও যে নতুন—নতুন! জেল-ফেরত বিজনবাবুর মতনই না? গৌরী তাকে আর ঠাট্টা তামাসা করতে পারবে না।

পালকের মত হাল্কা হয়ে আসে দেবলের পা। রাত, আকাশ, তারা—কিছু আর মনে থাকে না, চোখে পড়ে না। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে দেবল, খুশী মনে।

কিশোরী কম্পাউণ্ডারের বাড়ির কাছে এসে দেবলের বুকের গিয়ার যেন বদলে যায় আনন্দের উত্তেজনায়। ধক্ ধক্ করে ওঠে হৃৎপিণ্ডটা।

পা পা করে দেবল এগিয়ে আসে—আরও কাছে, বাড়ির প্রায় গায়ে-গায়ে। হঠাৎ চোখে পড়ে, খোলা জানলা; ঘরে বাতি জ্বলছে। ভাল করে তাকাতেই দেবল সব দেখতে পায়। দেখতে পায়, ঘরের দরজা বন্ধ। দেওয়ালে পিঠ রেখে—বিজন দাঁড়িয়ে, গৌরী নীচু হয়ে তার পায়ে প্রণাম করছে। বিজনের সেই পুরনো বেশভূষা। সতর্ক, সন্তর্পণভঙ্গী। গৌরী প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে, ছল ছল চোখেই বোধ হয়। বিজন ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দু' হাতে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর—তারপর—? দেবল কেমন যেন অজ্ঞান অসাড় হয়ে দেখে, বিজন গৌরীর মুখে মুখ রেখে তার দু'টি ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়েছে!

অকস্মাৎ কে যেন সপাং করে জোর এক চাবুক কষিয়ে দিল দেবলের পালক-নরম মনে। একটা অদ্ভুত, অসহ্য জ্বালা নিমেষেই সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ল। কর্ কর্ করে উঠল দুই চোখ। আগুনের ফুল্কি দমকা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ল, না, ছুঁচ ফুটল রাশি রাশি—হাতের মুঠোয়, আঙুলে, বুকে, মনে। মাথার মধ্যে যেন স্পার্ক মারছে আবার, ঘাড়ের প্লাগগুলো গরম হয়ে উঠেছে। অস্বাভাবিক একটা উগ্রতা তার সর্বাঙ্গের

রক্তস্রোতকে তপ্ত করে তুলেছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সরব শব্দ উঠছে। ঝড়ের দোলার মত ওঠা-নামা করছে ছেচল্লিশ ইঞ্চির বুকের ছাতি। কখন যেন জলির মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়েছে দেবল। আঙুলের জ্বলনটা কি থামবে না? জলি কি কামড়াতে ভুলে গেছে আজ? শালা, কাট্ কাট্, জানোয়ার কাঁহাকার! কঠিন নিষ্পেষণে দেবলের মুঠি যেন কারুর গলা টিপে ধরেছে। একটু শান্তি, একটু যন্ত্রণা। আস্তে আস্তে দেবল হাতের মুঠো তুলে ধরল। একটা শেষ জোর কামড় দিয়ে টেনিস বলের মত ছোট্ট পিকিনিজ কুকুরটা মরে গেছে দেবলের মুঠোর মধ্যে, নিষ্পেষণে। ছিটে-ফোঁটা রক্ত শুধু লেগে আছে দেবলের হাতের তালুতে। আর কিছু না। কিছু না।

চাঁদের আলোয় জলিকে দেখল দেবল, দেখল সেই দু'চার ফোঁটা তাজা রক্ত।

গৌরীর—ঘর অন্ধকার। বিজন পালিয়েছে।

মুঠোটা আরো আল্‌গা করে দিল দেবল। জলি খসে পড়ল পায়ের তলায়, বুনো তুলসীর ঝোপে। আজীবনের সঞ্চিত, সঙ্গোপন আনন্দের একটুকরো পরশমণি খসে পড়ে গেল হাত থেকে, বুক থেকে। প্রাণ থেকে।

দু'চার মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দেবল—বুকের হাড় ক'টা যেন কেউ কুরে কুরে কেটে দিচ্ছে। ভেঙে দিচ্ছে নিষ্ঠুরের মতন। আর সব ঝাপসা হয়ে আসছে—গৌরী, কিশোরী কম্পাউণ্ডার, পাথরচটি, মধুবন, রাধানাথপুর, সব—সব।

ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে পা বাড়ায় দেবল। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেবল সিংয়ের দুটি সজল চোখ।

•

ভাটিখানায় গেল না দেবল—ভাটিখানার পাশ দিয়ে যে পথটা সোজা গিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়েছে—সেই পথই ধরেছে ও।

মুসলিয়া কোলিয়ারীর সাইডিং-এর কাছে দেবল শুনল কে যেন ডাকছে। মন্মথ না ?

হ্যাঁ, মন্মথই। দেবল ছাড়া পেয়েছে শুনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে মন্মথ। কোথাও পাচ্ছে না।

ছুটতে ছুটতে মন্মথ কাছে এল।

'কি রে শালা, ডাকছি তো ডাকছি, গলা চিরে গেল। কালা হয়ে গিয়েছিস নাকি ?'

মন্মথর কথার কোনো জবাব দিল না দেবল। একটিবার শুধু দেখল তাকে। তারপর নির্বিকার ভাবেই আবার পা বাড়াল।

মন্মথ অবাক। কিছুই বুঝতে পারে না।

'আরে, যাস কোথায়— ?' মন্মথ গিয়ে দেবলের হাত ধরল।

কি আশ্চর্য, ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল দেবল ! যেন সাপের ছোবল থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছে।

মন্মথ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আর দেবল সোজা এগিয়ে চলল আবার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দিকে।

চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখল,

কি ভাবল যেন মন্মথ, তারপর চীৎকার করে বলল, 'তুইও চলে যাচ্ছিস, দেবলা? বেশ—যা শালা। যা। বেইমান!'

মন্মথর গলা থামল কিন্তু গলার মধ্যে অশ্রুর আবেগটা থামল না।

একটু থেমে ভাঙা গলায় মন্মথ শেষবারের মতন চীৎকার করে ডাকল, 'চারু-বউয়ের বাচ্চা হয়েছে, দেবলা—জানিস?'

সে কথারও কোনো উত্তর নেই।

দেবলের কাছে সাত বছরের পাথরচটি কি আজ এমন চাঁদের আলোতেও মরে গেল!